নীল সায়রে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রাকর : অর্জ্জুনকুমার ভৌমিক, নিউ সত্যনারায়ণ প্রেস

২৬, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের :

জন্মান্তরবাদের উপর বিস্ময়কর লেখা

কে ডাকে আমায়

ও

সমস্ত দেবতাদের নিয়ে লেখা

বহুরূপে দেবতা তুমি (যন্ত্রস্থ)

* * *

জীবনের ওপার থেকে

অবিশ্বাস্য

আজও যা ঘটে

অজানার আঙিনায়

।। এক ।।

গহিন রাত আদিম অরণ্যের রাত হয়ে উঠল শেষ অবধি।

স্ত্রীলোকটির আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢাকা। বয়েস কত বোঝার উপায় নেই। ছোটার ধরণ দেখে কম বয়সীই মনে হয়। উর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটছিল একটা দিকেই। এখন, এলোমেলো। উদভ্রান্ত। দিক বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে দৌড়াচ্ছে।

গন্তব্যস্থল কোথায় জানে না। তবু যেতে হচ্ছে। যাওয়া ঠিক নয়, পালাচ্ছে। না পালালে, মান-সম্ভ্রম প্রাণ কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না তার।

হাঁপাচ্ছে। নিজের দ্রুত নিশ্বাসে শত সহস্র মানুষের নিশ্বাস পড়ার আওয়াজ শুনছে। নিজের পায়ের শব্দে অগুণতি লোকের পায়ের শব্দ শুনছে। ওরা তাড়া করে আসছে পেছু পেছু। অসংখ্য পায়ের চাপে পিচের রাস্তার ওপর পিষে ফেলবে তার দেহ। মাড়িয়ে মাড়িয়ে মিশিয়ে দেবে রাস্তার ধুলোয়।

রাস্তা ভর্তি ঠাণ্ডা বাতাস। তবু মনে হচ্ছে বাতাস নেই তেমন। যেটুকু বা আছে, ঠাণ্ডা নয়। এত উষ্ণ, একটা শরীর—চক্ষের নিমেষে জ্বালিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে ফেলা এমন কিছু নয়।

সর্বশরীর ক্লান্ত হয়ে আসছে। দু'পা চলছে না আর। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। প্রবল আকুলি-বিকুলি একটা মাথা খুঁড়ে মরছে ভেতরে। একজন কেউ এসে পড়ুক। বাঁচাক তাকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। পা টলছে, পড়ে যাবে।

দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল সামনের ল্যাম্পপোস্টটা।

দুটো আলোর রেখা এগিয়ে আসছে। জনপ্রাণীহীন রাস্তা শ্মশান মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। সাহস ফিরে আসছে স্ত্রীলোকটির ধীরে ধীরে।

বিধাতা বলে কেউ আছেন তাহলে, নইলে এ সময়ে ট্যাক্সি আসছে কোত্থেকে।

ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে দিয়ে, এগিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়াল। ডান হাত উঁচু করে ঘন ঘন দোলাচ্ছে।

ট্যাক্সি এসে থামল।

দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। ওকে তুলে নেয়ার জন্যই যেন স্বয়ং বিপদভঞ্জন ড্রাইভার সেজে গাড়ি নিয়ে এসেছে। হেড্‌লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। ড্রাইভার দেখল, স্ত্রীলোকটির পায়ে জুতো নেই। সুন্দর পায়ে মেহেদির পাঁইজোরের ওপর ঘুঙুর লাগানো রূপোর পাঁইজোর চক চক করছে। পায়ে যার এত রূপ—সে রূপসী না হয়ে যায় কেমন করে। রূপ সাগরের রূপ ছেঁচে ছেঁচে গড়ে উঠেছে এ সুন্দরী।

কোন কথা বলল না। ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে ইশারায় ভেতরে ডাকল। মুখে মিষ্টি হাসি।

কিছু লক্ষ্য করেনি স্ত্রীলোকটি। লক্ষ্য—একটা আশ্রয়। সে আশ্রয় সুমুখে তার। একরকম ঝাঁপিয়েই উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

ঝড়ের বেগে ট্যাক্সি ছুটছে।

অমৃতসরের এই রাস্তাটাসুদ্ধ তোলপাড় করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি ড্রাইভার। আয়না দিয়ে তার সওয়ারীকে দেখছে বার বার। নিষ্প্রাণ স্থাণুর মতো বসে আছে। মাঝে মাঝে যা গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলে উঠছে।

স্ত্রীলোকটি জানে না কোথায় যাচ্ছে সে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে ড্রাইভার। মনে সে প্রশ্ন আসেনি। মনের অবস্থাও সেরকম নয়। যে মৃত্যুগহ্বরে আটকে পড়েছিল সে, সেখান থেকে বেরোনো দুষ্কর। বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তার ওপর ট্যাক্সি পেয়েছে—এই যথেষ্ট। অন্তর্যামী-ড্রাইভার যেখানে নিরাপদ বুঝবে, নামিয়ে দেবে সেখানে ঠিকই।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার—সে কোথায় যাবে—একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করল না ড্রাইভার।

সওয়ারীকে দেখার সঙ্গে, ঘাড় বেঁকিয়ে, মাথা নীচু করে দেখছে ড্রাইভার সওয়ারীর দু'পা।

চলতে চলতে গাড়িটা একটা ধাক্কা খেয়ে পেছু হেটে থেমে গেল যেন।

লাঠি-বল্লম-টাঙি হাতে কজন সশস্ত্র যুবক পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে সামনে। স্ত্রীলোকটি ঝাঁকুনির ধকলে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল নিজেকে সামনের সীটের ওপরটা চেপে ধরে।

ড্রাইভারের মুখে কোন প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন নেই।

ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির আচ্ছন্ন ভাবও কেটে গেছে। ভয়ে কেঁপে উঠেছে বুক। হিম হয়ে এসেছে হৃৎপিণ্ডের রক্ত। যে ড্রাইভারকে ভেবেছিল বিপদভঞ্জন-রক্ষক-অন্তর্যামী—এখন দেখেছ সব উল্টো!

ড্রাইভার নিজেই নির্বিকার মুখে দরজা খুলে দিল। সশস্ত্র যুবকেরা ভেতরে ঢুকে স্ত্রীলোকটিকে টেনে বার করবে। বলিষ্ঠ চেহারার ড্রাইভার বাধা দিলে দিতে পারত, দেয় নি। দেয়ার ইচ্ছেও নেই তার। স্ত্রীলোকটি লক্ষ্য করুক না করুক, দূর থেকে শোনদৃষ্টি ড্রাইভারের কি আর এদের ওপর লক্ষ্য পড়ে নি? গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পথ ধরে পালিয়ে যেতে পারত না কি আর? অনায়াসেই পারত।

পারত বলেই করে নি। নিজের দলের লোকের সঙ্গে বেইমানী করবে কেমন করে? ড্রাইভার কে—কাদের লোক—দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল সমস্ত স্ত্রীলোকটির চোখে। বোরখার আবরণটা খোলেনি মুখ থেকে। চোখের কাছে—জালি কাপড়ের চোখ দুটো দিয়ে সবই দেখছে। অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট। একটা জাল ছিন্ন করতে গিয়ে শত জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ল বুঝি স্ত্রীলোকটি।

দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ হারানো শক্তি ফিরে পেল একটি যুবকের স্পর্শে।

যুবকের শক্ত মুঠো চেপে বসেছে ডান হাতের কব্জিতে। সজোরে টানছে নামানোর জন্য।

নিশুতি রাত কেঁদে উঠল স্ত্রীলোকটির আর্তস্বরে। ধস্তাধস্তি টানাটানি মুক্তির আকুল অহ্বান— কিছুতেই কিছু হল না। নির্দয়রা সবাই মিলে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি অসহায় নারীর ওপর।

ওরা বোরখার ওপর দিয়েই কাপড় বাঁধল মুখে। পিছমোড়া করে বাঁধল হাত-পা। তারপর নিয়ে গেল অন্ধকার গলির ভেতর—একটা পোড়ো বাড়িতে।

যোঝাযুঝির ক্ষমতা হারিয়েছে, হুঁশও হারিয়েছে স্ত্রীলোকটি।

যে বাড়িতে নিয়ে এলো জোয়ানরা, সে বাড়ি এক কালের বনেদী বংশের বাড়ি। মালিকদের কেউ বেঁচে আছে কিনা, জানে না কেউ। যদি থাকে—কোথায় থাকা সম্ভব—তাও কেউ বলতে পারে না।

বাড়িটার ভগ্ন দশা।

অনেক ঘরের কড়িবরগা ঝুলে পড়েছে।

স্ত্রীলোকটি যে ঘরে বন্দিনী, সে ঘরেরও একদিকের কড়িবড়গা ঝুলছে। যে দিকটায় ঝুলছে, তারই তলায় চারপাইয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। মৃত্যু যদি স্বেচ্ছায় আসে আসুক। ছাদ চাপা পড়ে এমনিতেই যদি মরে, মরুক। অর্ধেক রাত এখনো বাকি।

রাত পুহিয়ে আসছে।

চোখের ভারটা কেটে গেছে সম্পূর্ণ। স্বাভাবিক হালকা লাগছে। স্ত্রীলোকটি চোখ খুলল আস্তে আস্তে। ভেতরটা আলোআঁধারি। চিড় খাওয়া জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের আলো ঢুকছে।

সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। বুঝতে পারছে না স্ত্রীলোকটি কোথায় এসেছে সে। বুকের ওপর কড়িবরগা ঝুলছে দেখে আঁতকে উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পুরনো নড়বড়ে চারপাই থেকে নেমে দাঁড়াল। এখানে কেন?

রাতের দুঃস্বপ্নের মতো এক এক করে ভেসে উঠছে সব। তার

পালানোর পথে ট্যাক্সিতে ওঠা…দুর্বৃত্তদের কবলে পড়া! হাত-পা মুখ বাঁধা অবধি মনে আছে, তারপর আর কিছু মনে নেই। এ ঘরে পুরেছে কে—জানে না। সমস্ত বাঁধন খুলে দিয়েছে কে—তাও অজানা।

যেখানে ছিল, সেও বন্দিনী। এও তাই। তবে এখানেই তার শেষ হয়তো। উদ্ধারের উপায় নেই। সেখানে একটি লোকের আশা ছিল। এসেছিল সে। তার কাজ সে শেষ করেছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে মুক্ত করল! কিন্তু সে গেল কোথায়।

স্ত্রীলোকটির দু'চোখ উপচে টপ টপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল।

চোখে জল ঝরল যার, ভেতরে তার জল কোথায়, আছে কি? একটু ছিটেফোঁটাও নেই যে। একদম শুকনো খরখরে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল দেবে কে?

স্ত্রীলোকটি ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে দরজার দিকে এগোল, এগোল জানলার দিকেও। দরজার ভেতরের কড়া ধরে খুব সন্তর্পণে টানল নিশ্বাস বন্ধ করে। বাইরে থেকে বন্ধ। পালানোর উপায় নেই। ফাঁকে কান রাখল খানিক। কারো সাড়াশব্দ শোনা যায় কিনা। শোনা গেল না। জানলার ফাটা পাল্লায় কান রেখেও দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। এদিকটা আরো নিস্তব্ধ। বাতাসের প্রবেশও বা নিষিদ্ধ।

বোঝা যাচ্ছে, যারা এনে বন্দিনী করে রেখেছে, তারা কেউ উপস্থিত নেই।

ভোরের আলো ফোটার ভয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে সকলে মিলে। জায়গাটা কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে।

জানলার ধারে কাঠের বাতিদানিতে একটা মোমবাতি জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। তার চোখ মেলার আগে পর্যন্ত জ্বলেছে বোধহয়। মোম গলে গলে ধারা নেমেছে চতুর্দিকে।

পাল্লাদুটো ঠেলল দু'হাত দিয়ে। খুলল না জানলার পাল্লাও। বাইরে থেকে এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঘরের ভ্যাপসা আঁশটে গন্ধে অস্বস্তি বাড়ছে দারুণ! সেই সঙ্গে তেষ্টাও।

পেতলের গাগরীটা ঢাকনা খোলা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে রয়েছে এক কোণে। জল নেই। ওটার দিকে নজর পড়তেই জলের জন্য হাহাকার করে উঠছে ভেতরটা বড্ড বেশী। জল না পেলে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে এখুনি।

আচমকা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ল যেন হাতের ওপর। ভ্রম না সত্যি? গাল থেকে নামাল হাত। আঙুলের ওপর জিভ ঠেকাতেই নোনতা স্বাদে সভয়ে সরে এলো তাকের নীচে থেকে। চোখ বড় বড় করে তাকাল। রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়েছে আঙুলের ওপর।

তাকের উপর আলকাতারা রঙের ট্রাঙ্কটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। স্ত্রীলোকটির মনে হল, কে যেন দু'হাতের বজ্রকঠিন আঙুল দিয়ে তার গলা টিপে ধরছে। বাঁচার জন্য চিৎকার করেও কারো সাহায্য চাইতে দেবে না তাকে। জোরে জোরে, আরো জোরে চেপে ধরছে।

অস্থির হয়ে বোরখাটা খুলে ফেলল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বোরখা খুলে চারপাইয়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলার সময় বজ্রকঠিন আঙুলের চাপও গলার ওপর থেকে সরে গেল।

এদিকে তাকের ট্রাঙ্ক থেকেও রক্ত চোঁয়াচ্ছে! পড়ল মাথার সিঁথিতে পড়ল লালচে চুলের বিনুনির পাকে পাকে।

বোরখা খসে পড়তে যে বেরিয়ে এলো সে তরুণী। এত ক্লান্তি এত ভীতি—তবু এ মেয়ে অপরূপা।

ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে তরুণী।

ছুটে গেল দরজার দিকে, ছুটে গেল জানলার দিকে। দুম দুম করে ঘুষি মারছে। মর্ম ছেঁড়া আকুতি বেরিয়ে আসছে কণ্ঠস্বরে। ম্যাঁয়নু বঁচাও, ম্যাঁয়নু বঁচাও! আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

বাইরে থেকে ধমকানির আওয়াজ সমুদ্র গর্জনের মতো গর্জে উঠল তরুণীর আর্তনাদ ছাপিয়ে। চুপ কর বলানাপা। নেহি তা তেন্নু হোনে হি ঠিক কর দেওয়াগা। চুপ করে থাক বলছি! নইলে দেখাচ্ছি তোকে।

দরজার বাইরে থেকে অনবরত শাসাতে লাগল প্রৌঢ় একই কথায় ভয় দেখিয়ে।

এ কথার একবর্ণও কানে যাচ্ছে না তরুণীর। তরুণী বধির। নিজের আর্তনাদ নিজেই শুনছে কেবল। মৃত্যু যার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে হন হন করে, নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণটুকু মুঠোয় পুরবে বলে, সেও কি বাঁচার চেষ্টা না করে পারে? নির্ধারিত মৃত্যু জেনেও নির্দ্বিধায় আলিঙ্গন করে নিতে পারে ক'জন?

তরুণীর মতো আশায় বুক বেঁধে আছে যারা, তারা পারে না। মৃত্যুর মুখের মধ্যে গিয়েও বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করবেই করবে।

বাতাসে কান্নার সুর ভাসছে। শূন্যে মাথা কুটছে একটা মৃত্যুযন্ত্রণা একটা নিঃশেষ প্রায় প্রাণের পরশ। কেউ শুনছে কি? কারো প্রাণে মমতা জেগে উঠছে কি? ছুটে আসছে কি আবার অন্য কেউ তরুণীকে উদ্ধার করার জন্য?

কেউ নয়। এ জায়গায় উদ্ধার করতে আসবে না কেউ। যদি কেউ আসে, সে বাঁচানোর জন্য নয়, চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যই আসবে।

সে এলো।

সে তরুণ। সে সুন্দর। সুন্দরের মধ্যে যে অসুন্দরের এত বীভৎস রূপ লুকিয়ে থাকতে পারে—এটা ধারণার কল্পনার বাইরে। যা ধারণার কল্পনার বাইরে, তাই-ই তো বাস্তবে ঘটে আশ্চর্যভাবে মানুষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়ে, স্তব্ধ পাথর করে দিয়ে।

যে এলো, সে শুনল কিছুক্ষণ তরুণীর কান্নামেশানো আকুল আহ্বান। ম্যাঁয়নু বাঁচাও, ম্যাঁয়নু বাঁচাও।

বাঁচাও। তরুণের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অস্ফুটে। ঘেন্না-বিতৃষ্ণার রেখা ফুটে উঠল কপাল জুড়ে। বিদ্রুপের হাসি ঠোঁটের কোনে, চোখের কোনে। হাসতে হাসতেই বলল তরুণ প্রৌঢ়কে।

—এদি জান খতম হোনওয়ালী হ্যাঁয়, দোয়ার খোল দেও…!

এখুনিইতো শেষ হয়ে যাবে, দরজাটা খুলেই দাও না। চাবিটা দাও।

তরুণের চোখের দিকে তাকাল প্রৌঢ়।

এ চোখ চেনা তার, এর পরের কি কাজ তাও জানা। ওর ওপর বিশ্বাস আছে। তবুও একবার বলল—না বললে চলত—তৈরি হয়ে খোলাটাই কি উচিত ছিল না?

তরুণ হাসল আবার। ছোবল মারার আগে সাপ যদি হাসে, আর সে হাসি যদি কেউ বুঝতে পারে, সে এই হাসি দেখলে হয়তো বা বুঝতে পারত। ছোবল মারার আগেরই হাসি ফুটে উঠেছে তরুণের মুখে পরিষ্কার।

পান্‌জাবীর তলা থেকে চোখের পলকে চকচকে ছোরাটা বার করল তরুণ। শক্ত মুঠোয় বাঁট ধরে নিজের চোখের সামনে একবার তুলে ধরল। কপালে ঠেকাল, চুমু খেল। প্রৌঢ়ের চোখের সামনে এগিয়ে ধরল। তরুণের পুনরাবৃত্তি করল প্রৌঢ়। কপালে ঠেকাল, চুমু খেল। পিঠ চাপড়ে হাসতে হাসতে বলল, সাবাস্ বেটা। বাহাদুর বেটা। আমি জানি। তবু সাবধানের মার নেই। শয়তানী কি মূর্তি ধরে আছে তা কে জানে।

যেমনই শয়তানী হোক—তোমার তো আর দেখতে বাকি নেই। এ বান্দার হাতের মাটির পুতুল।

মুঠোর চাপে কোথায় মিলিয়ে যাবে।

চাবিটা হাতে তুলে দিল প্রৌঢ়।

দরজা খুলল যুবক। চৌকাঠের ওদিকে পা দিয়েছে সবে, চমকে উঠল তরুণী। স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে তার আর্তকান্না। বোবা হয়ে গেছে।

মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বেরোচ্ছে না। দু'টি ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে।

এমন চিন্তা কেন আসছে জয়মালার মাথায় ?

চেষ্টা করে দূরে সরাতে পারছে না। জেঁকে বসছে আরো। নিদারুণ অস্বস্তি।

অতীতের বিভীষিকা এভাবে আর ঘোরাফেরা করবে কতক্ষণ? অতীত জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। একেবারে সামনাসামনি। জয়মালা প্রত্যক্ষ করছে। তার নিজের জীবনের নয় এসব, তবু মনে হচ্ছে নিজের জীবনেরই বুঝি। হয়নি, হবে হয়তো।

আবার এও মনের কোনে উঁকি মারছে, সুধার জীবনে ঘটতে যাচ্ছে সমস্ত ঘটনা। ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর, সুধার ওপর।

ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পায়চারি করতে করতে থামল জয়মালা।

কুলুঙ্গির ভেতর থেকে জল ভর্তি কালো রঙের হাতকুঁজোটা বার করে, দুহাতে ধরে জল ঢালতে লাগল মুখে।

আকণ্ঠ পিপাসা। জল শেষ হয়ে গেল। ভেতর ভিজল না তবু।

জানলার ধারে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টি-ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে সন্ধ্যের মুখে। ভালো লাগছে না। দুপুর রোদ্দুরের আগুনের হলকা যেন। যতদূর চোখ যায় দেখল। কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় আর বাবলাগাছ। সাদামাটির রাস্তাটা নিঝুম। লোকজন চলছে না বললেই হয়। আঙ্গুলে গুনলে দুএকটা। আকাশের নীচে একটা ধোঁয়াটে ভাব।

সরে এলো।

চারপাইয়ের ওপর লাল কম্বল বিছানো।

বসল পা মুড়ে। আনমনা হয়ে পড়ছে। আবার বিদঘুটে চিন্তা, ভয়াবহ অনুভূতি। লাল কম্বলে তাজা রক্তের প্রলেপ, তাজা রক্তের চাপ। বসতে পারল না উঠে পড়ল। ঘরের দরজা খুলে দেখল উঁকি মেরে। কেউ আসছে না, কেউ আসেনি। সুধা এলোনা এখনো। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামছে। এতদিনে একদিনও হয়নি এরকম।

খোলা দরজার পাশে বেতের মোড়া। দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসল। বসে আছে চুপ চাপ গালে হাত দিয়ে। আগের দৃশ্য দেখছে আবার!

ঘরের ভিতরে তরুণী।

তরুণও প্রবেশ করেছে ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল যুবক। ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে, ইশারায় চুপ করে থাকতে বলল তরুণীকে। তারপর কাছে এসে, কানে কানে বলল, ইরা। তোমার কোন ভয় নেই। আমাকে তো চেনো, জানো, সর্দারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

ইরাবতী স্তব্ধ পাথর।

ঠোঁটের কাঁপুনী কমেছে। সত্যিই ইরাবতী চেনে কিরণকে। এক আধদিনের নয়, ছোটবেলা থেকেই। কতবার না গেছে কিরণ কাহানগড়গাঁ থেকে সান্তাপুরগাঁয়ে। অনন্তর সঙ্গে কত না ভাব ভালোবাসা।

মাঠভর্তি পাকাধান দেখে খুশী হয়ে ছুটোছুটি করছে ইরাবতী। সঙ্গে অনন্ত। অনন্তরও আনন্দ আর ধরে না! দুজনেই হাত ধরাধরি করে সোনালী ধানগাছের ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলেছে। কিরণ এসে হাজির হয়েছে। তাদের খুশীতে যোগ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। চাষীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে। কনক নে ফসল পাকিয়া নে, বাদল মে খুশিয়াঁ বসিয়াঁ নে। পাকা ফসল হল সোনালী, বাদলের সাথে করে খুশীর মিতালী।

কিরণ হাসতে হাসতে বলেছে, ইরা! তোমাকেই সোনালী ধান মনে হচ্ছে! তুমি লক্ষ্মী, তুমি ভোরের আলোর মতো সুন্দর শুদ্ধ।

অনন্ত মুচকে হেসে বলেছে, তুই কবি হলি আবার কবে থেকে? জানতাম না তো!

—জানবি কেমন করে? এ যে ছাই চাপা আগুন। এক জ্যোতিষী হাত দেখে কি বলেছে জানিস? বলেছে, তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে একদিন আকাশে বাতাসে।

—নাম তো অনেক রকমেরই আছে। দুর্ণাম নয় তো? বলে, মুখ টিপে হেঁসেছে ইরাবতী।

ছদ্মকোপে কিরণ ফেটে পড়েছে। শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলেছে, দুর্ণাম! তার আগে এ বান্দা বুকে ঘুষি মেরে মেরে পাঁজর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তারপর হৃৎপিণ্ডে ঘুষি মেরে থেঁতো একদম।

সেই সরল প্রাণখোলা হাসিখুশি মানুষটা এমন পরিবেশে এমন মূর্তিতে।

মনের কথা মনে শুনলো যেন কিরণ। বলল, অত ভাবছ কি? আমার কথা—এখানে কেন? পরে সব জানবে সব শুনবে। এখন সময় নেই। একদণ্ড দেরী করলে চলবে না আর। অন্যেরা এসে পড়বে।

বাইরে থেকে দরজা ধাক্কার শব্দ। ভাঙা দরজাটা ভেঙ্গে পড়বে বুঝি এখুনি। সরদার ঠেলছে। দরজা খুলল কিরণ। গম্ভীর মুখ। ইরাবতীর ডানহাতটা চেপে ধরে বলল, আমার আত্মীয়। নিয়ে যাচ্ছি।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখেছে সর্দার। কোন বাধা দেয়নি। মুখ দিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করেনি। কিরণকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই হয়তো তার। বলারও না।

ইরাবতীর মনে হ'ল কিরণই সর্দার। লোকটা কিছু নয়। অনুগত স্রেফ।

যেখানে এনে রাখলো ইরাবতীকে, সে পরিবেশের কথা মুখে আনা যায় না। অতি জঘন্য। রঙিন নেশা ঘন হতে হতে রক্তচক্ষু সকলের। মেয়ে পুরুষের। একটা অন্ধকার গলি। দুপাশে কাঁচামাটির ইঁটে দোতলা বাড়ি—গায়ে গায়ে। এ বাড়ির ছাদ থেকে ও বাড়ির ছাদে যাওয়া যায়। লোকগুলো সব কেমন কেমন। এমনতর লোকজনের সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি ইরাবতীর। বিষাক্ত মহল্লা, বিষাক্ত এদের নিশ্বাস।

ইরাবতীর বুকের ভেতর দুরদুর করছে ভয়ে। বিশ্বাসী লোককে অবিশ্বাস্য জায়গায় দেখলো প্রথমে। সেখানকার চেয়েও অবিশ্বাস্য এ জায়গাটা। চমকে উঠল ইরাবতী। সারা শরীরের রক্ত চন চন করে উঠল।

কিরণ বলছে সকলকে ডেকে—বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলকে।—আমার বিবি। বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম। তোরা ভালো করে নজর রাখবি। কোন কষ্ট যেন না হয়। ব'লে চলে গেল কিরণ।

দোতলায় মাঝখানের ঘরে রাখা হ'ল ইরাবতীকে। ইরাবতী বুঝলে। সে বন্দিনী। এখানকার সকলের চোখ প্রহরী হয়ে ঘুরছে তার চারধারে। অসহায় ইরাবতীর মুক্তি নেই কোনদিন এখানে থেকে।

শুধু বন্দিনী হয়ে থাকলেও কোন কথা ছিল না, যদি না মাঝরাতে অন্ধকার নরকের বুক চিরে উঠে আসত এক প্রেতাত্মা। যদি না কঠিন আলিঙ্গনে টেনে নামিয়ে নিয়ে যেত জাহন্নমের অতল তলে।

রাতে এসেছে কিরণ।

চিবুক ধরে আদরের সুরে বলেছে, ঘুমোওনি? একি কাঁদছো কেন?

ইরাবতী উত্তর দেয়নি কোন। কেন কাঁদছে—কার কাছে বলবে? কি বলবে? পশুপক্ষীও নিজের বিপদের আঁচ পায় আগে থেকে। ইরাবতীও পাচ্ছে। কিরণের দু'চোখের তারায় নাচছে তার সর্বনাশ।

মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিজের ওপর সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে, যেটুকু চেষ্টা করা দরকার করেছে। বলেছে, অনন্তকে মনে আছে তোমার? তোমার ছেলেবেলার সঙ্গী?

নির্বাক মুখে কিরণ চেয়ে থেকেছে।

ইরাবতী বলছে, তখন আমরা লাহোরে। দাঙ্গায় আগুন জ্বলছে চতুর্দিকে। মেহেরউদ্দীনকে চেনো তো? অনন্তর মতো তোমারও তো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। মেহেরাজ আশ্রয় দিল।

ছ'চোখে হাতচাপা দিল ইরাবতী। কান্নায় ভেঙে পড়ল। একটু সামলে, কান্নাভেজা গলায় বলল, এমনই হতভাগিনী ছ'জনকেই হারালাম। ওরা না গিয়ে, আমার মরণ হল না কেন?

পালিয়ে এই অমৃতসরে চলে আসার জন্য সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে ফেলেছিল মেহেরাজ, ব্যর্থ হয়ে গেল তার প্রাণপণ চেষ্টা। পথে ধরা পড়ে গেল। শমীগাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়। চেনা লোকই চিনিয়ে দিল ছুর্বৃত্তদের।

এ রকম যে একটা ঘটতে পারে আগে থেকেই বোধহয় অনন্তর মন বুঝতে পেরেছিল। মেহেরাজের হাতছুটো নিজের বুকে চেপে ধরে বলেছিল, আমার যদি কিছু হয়, বিবিকে দেখো তুমি।

ইরাবতীর দিকে ফিরে বলেছিল, যার ওপর তোমার ভার দিয়ে গেলুম ইরা—কোন ভয় নেই।

বেরোনোর মুখে এ কথা নাই বা আনলে? তোমার যাওয়ার আগে আমার যাওয়াটাই কি কাম্য নয়? জলে ডবডবে হয়ে উঠেছিল ইরাবতীর ছুচোখ।

পেছন থেকে ছোরার ঘায়ে মর্মন্তুদ মৃত্যু ঘটেছে মানুষটার। আর বেঁচে থাকা কার জন্য? আত্মঘাতী হতে চেয়েছে ইরাবতী। হতে দেয়নি—মেহেরাজ চোখে চোখে রেখেছে তাকে। বোরখা পরিয়েই রাখত দিনরাত। লোকের কাছে বলত আমার বেগম।

কথাটা যে কানে লাগত না, তা নয়। কানে কেন—মনেও লেগেছে। ভয় ধরেছে। অমন দেবতার মতো মানুষকে—সত্যিই দেবতা—সন্দেহ করেছে। 'বেগম বেগম' বলে রটাচ্ছে কেন? কোন ছুষ্টু মতলব নেই তো?

ইরাবতীর এ ভাব চোখ এড়ায়নি মেহেরাজের। তাই কি মর্মান্তিক সাজা দিয়ে গেল তাকে? ভুল ভেঙে দিয়ে গেল নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে।

রাতের অন্ধকারে নিয়ে আসছিল এপারে। সীমানা পার হতে

যাচ্ছে দু'জনে, কার যেন পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল মেহেরাজ, বলল, তুমি পালাও। আমি পথ আগলাচ্ছি।

ইরাবতী বলল, আমাকেও মরতে দাও তুমি।

মেহেরাজ বলল, মেরে ফেললে তো কথা ছিল না। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে ওরা ওদের জন্য। তুমি না পালালে আমি মরে গিয়েও যে শান্তি পাবো না ইরা। অনন্তর আত্মাও যে শান্তি পাবে না। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, শীগগির—

ইরাবতীকে ঠেলে দিল এপারে মেহেরাজ।

ছুটছে ইরাবতী। বোরখা পরা। ছুটতে ছুটতে জরির চটি জুতো কোথায় খুলে পড়ে গেছে কে জানে, খেয়াল নেই। ছুটছে ছুটছে ছুটছে।

দড়াম দড়াম বন্দুকের আওয়াজ। ইরাবতীর দু'কান বধির হয়ে গেল যে। ওপার থেকে মেহেরাজের করুণ আর্তস্বর ভেসে এলো— পালাও।

ইরাবতী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল না আর। শুনতে পেল না দ্বিতীয়বার আর মেহেরাজের কণ্ঠস্বর। রাস্তার বুকে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করেছে। নির্জন রাস্তায় কেউ আসেনি, কেউ সান্ত্বনা দেয়নি। তুলে বসায়নি কেউ।

নিজে নিজেই উঠেছে। বাতাসে শুনেছে যেন মেহেরাজের শেষ কথা—পালাও। কে যেন ঠেলে ঠেলে ছুটিয়েছে তাকে। অমৃতসরের রাস্তায় ট্যাক্সি পেয়ে ভেবেছিল—

হাসল কিরণ। বলল, ঠিক জায়গায় তো এসে পড়েছো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তা না হলে এমন যোগাযোগটা হল কেমন করে। ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। মেহেরাজ তোমায় বেগম বলেছিল, আমি বিবি বলেছি ওই একই কারণে। কু-মনের মানুষের তো অভাব নেই। আমার বিবি। ভয়ে ধারেকাছে ঘেঁষবে না কেউ।

নীতির বুলি কপচেছে কিরণ অনেক। যুক্তির জাল বিস্তার করেছেও অনেক। আত্মসমর্থনে বলেছে, দাঙ্গার সুযোগে মেয়ে নিয়ে সুযোগ সন্ধানীরা ব্যবসা করতে শুরু করে দিয়েছে, নিশুতি রাতে ওৎ পেতে বসে থাকে ওরা, আড়ালেআবডালে। যে মেয়ে পালায় প্রাণ ভয়ে বা যে কোন কারণে—ট্যাক্সি লোকলস্কর ছড়ানো থাকে—এসব মেয়েকে তুলে নিয়ে নিজেদের খপ্পরে ফেলার জন্য। ভাঙা বাড়ির ভাঙা ঘরের তাকে ফুটো ট্রাঙ্ক থেকে কাটা পাঁঠার রক্ত ঝরে পড়ে টপ টপ করে। বন্দিনী মেয়ে ভয়েময়ে কব্জায় এসে পড়ে সহজে। স্নায়ু শিথিল হয়ে যায় তার। মন দুর্বল। না মরেও মরার মতো হয়ে পড়ে।

ইরাবতী শিউরে ওঠে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক একটা দৃশ্য। গত রাতের দৃশ্য। ...ট্যাক্সিতে ওঠা...ভাঙা বাড়িতে বন্দিনী...রক্ত...এখানে আসা। নিজের দলের কথা—নিজের আত্মপরিচয় কি দিচ্ছে কিরণ এইভাবে। অপরের বলে? ইরাবতী অস্থির হয়ে পড়ল। আগে চেনেনি মানুষটাকে। দেবতার ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ রাহু এ।

কিরণ বলল, আমরা কিন্তু ওই রকম একটা ফাঁদ পেতে রেখেছি। ঠিক ওদের মতো একেবারে। বাইরে থেকে দেখলে ভুল বুঝবে লোকে! তা বুঝুক ক্ষতি নেই। তারা কিন্তু পরোপকারই করছে। মেয়েদের আটকে রেখে বুঝিয়েসুঝিয়ে ঘরে পাঠাচ্ছে আবার। সেও তো ইরাবতীকে নিয়ে এসেছে এখানে নিজের লোক বলে।

কিরণের চোখের মুখের হাবভাব বদলাচ্ছে। ইরাবতীর কাছে এগিয়ে এসেছে। গায়ে গা ঠেকছে। সরে যেতে গেল ইরাবতী। কিরণের শক্ত বাহুর বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না নিজেকে। চিৎকার করেছে, ডেকেছে লোকদের তাকে উদ্ধার করার জন্য। ডাক শুনেও গোটা বাড়িটার কেউ শোনেনি। জেগে ঘুমিয়েছে সকলে। টুঁ শব্দটি পাওয়া যায়নি কারো। আসেনি সাহায্য করতে কেউ। বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার সাহস্ শক্তি নেই বুঝি এবাড়ির ছেলে-

বুড়ো কারোর। নয়তো কিরণের তাঁবেদার সকলে। ওর তৃপ্তির মদত যুগিয়েই ধন্য হয় সবাই।

মোড়া থেকে উঠে পড়ল জয়মালা। দেয়াল ঘড়ির টক টক শব্দে হাতুড়ির ঘা পড়ছে যেন তার বুকে। কেবলি মনে হচ্ছে সুধার কোন বিপদ হল না তো? ইরাবতীর মতো বিপদে পড়েনি তো?

চারপাইয়ের ওপর থেকে লাল কম্বলটা তুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের এক কোনে। নেয়ারের ঘন বুনুনির চারপাইয়ে—নেয়ারের ওপরই বসে পড়ল ধপাস করে। ঠাণ্ডা বাতাসেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। গলার খাঁজে চোখের কোলেও। বাতাস বেশ ভারী ভারী লাগছে। নিশ্বাস নিতে অসুবিধে ভোগ করছে খুব। মৃত্যুর আগে কি এই রকম যন্ত্রণাই হয় মানুষের?

সুধার বিয়ের আর দুদিন বাকি।

বাপ নিরুদ্দেশ। মা পরিষ্কার বলেছে, যখন জয়মালার হাতে সুধাকে তুলে দিয়েছিল, কে এর বাপ—বলতে আজ আর দ্বিধা নেই তোমার কাছে। অন্ধকার রাজ্যের রাণী করেছিল যে পুরুষ তাকে—সে তো পালিয়ে গেল মাসখানেক পর। তারপর কত পুরুষেরই মন টানতে হয়েছে তাকে রাতেদিনে। ও কার মেয়ে জানবে কেমন করে?

জয়মালার দুচোখ ছলছল করে উঠেছে।

বুকে চেপে ধরেছে সুধাকে। নিজের সমস্ত স্নেহমমতা উজাড় করে দিয়ে যেন নিজেকেই প্রাণভরে ভালোবেসে পরিতৃপ্তি পেয়েছে সেদিন। সুধার মাকে বলেছে, আর আমি শুনতে চাই না কিছু। যা শোনার হয়ে গেছে। ও আমার ছোট বোন।

সুধাতে জয়মালাতে বছর আষ্টেকের ছোটবড়। জয়মালা বড়, সুধা ছোট। চোদ্দ বছর বয়েসে সুধা এসেছে। যে বাড়িতে থাকে,

সে বাড়িতে আর রাখা সম্ভব নয়। পাঁচজনের চোখ পড়ছে। ওরা বলে, মেয়েটা তো দেখতে শুনতে মন্দ হচ্ছে না। মায়ের মতো মেয়ে হোক —এটা চায়না মা সর্বান্তকরণে। বিয়ে-থা যদি সম্ভব হয়—হলে সুখী হয়।

সুধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, হেসে বলেছে জয়মালা, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

চার বছর ধরে কাছে রয়েছে সুধা, সন্ধ্যের পর কাছ ছাড়া হয়নি কখনো। মায়ের কাছে যে যাবে, সে রাস্তা বন্ধ। মা তার হাতে সঁপে দেয়ার পর দেশত্যাগী হয়েছে। জয়মালাকে বলেই গেছে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবে এবার। যদি মনের শান্তি পায়। অনেক জ্বালা বুকে পোষা রয়েছে। মেয়েটার জন্য বন্ধন ছিল, কাকে দি কাকে দি। ভালো আশ্রয় মিলিয়ে দিয়েছে ঈশ্বর। আর কেন?

সুধা কোথায় গেল? কাউকে দিয়ে খুঁজতে পাঠাবে? মন বলছে, না। খুঁজতে হবে তোমাকেই।

ইরাবতীর দশা কি হবে সুধার? মৃগেন কি কিরণ নাকি?

দুশ্চিন্তা ঝেড়েমুছে ফেলে দিতে চেষ্টা করল জয়মালা। এসব ভাবাও অমঙ্গল। সুধা সরল, সুধা ভালো। সে-অন্ত প্রাণ। ওর মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। জয়মালার এ সমস্ত পাগলের মতো ভাবনা। একজনের জীবনকে আর একজনের জীবনে টেনে আনা। কি বিচ্ছিরি মনের মানুষ হয়ে পড়েছে জয়মালা?

নিজেকে অনেক বোঝাল মনটাকে ঘুরিয়ে ফেলার জন্য পারল না। তার ভেতর আজ কে যেন জিদ করে বসে আছে—ইরাবতীর সম্পূর্ণ জীবন নতুন ক'রে শোনানোর জন্য। না শুনতে চাইলেও, না দেখতে চাইলেও, সে শোনাবেই সে দেখাবেই আজ তাকে।

ইরাবতীকে স্ত্রীর মর্যাদা দোব দোব বলেও কিরণ দেয়নি। বছর ঘুরতেই ইরাবতীর কোলে এসে হাজির হল পাপের ফসল। মেয়ে। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুলের ফুটফুটে মেয়ে। কিরণের মুখ বসানো। টানা চোখ, টিকলো নাক জোড়া ভুরু—কুচকুচে কালো।

কিরণ তো সোনার ঘড়ায় বিষে ভরা। এও কি তাই হবে নাকি? মেয়েটার নাম রাখল ইরাবতী জহান্নম। এমন নাম ভূ-ভারতে কেউ শুনেছে নাকি? 'নরক' কারো নাম হয় বুঝি? ইরাবতীকে প্রশ্ন করেছে কিরণ।

—হয়, না হলে, এ মেয়ে জন্মালো কি করে? নরক থেকে নরকই জন্মায়। দেবতা জন্মায় কি? ইরাবতীর মোক্ষম জবাব।

—না, আমার মেয়েকে জহান্নম বলা চলবে না তোমার।

ইরাবতীর কথা কইতে ইচ্ছে করে না কিরণের সঙ্গে। যতটা পারে এড়িয়ে যায়। বিতর্কে যোগ দিল না। চুপ করে রইল।

গম্ভীর গলায় শাসানির সুরে কিরণ বলল, জহান্নম বলা একদম চলবে না বলে দিচ্ছি। জিভ উপড়ে নোব তাহলে। জহান কথাটা মিষ্টি। জহান বলে ডাকবে ওকে।

মুখে জহান বলে ডাকলেও মনে মনে জহান্নমই বলত ইরাবতী। বিষ পেলে, মেয়েটাকে খাইয়ে শেষ করে ফেলত। পায়নি। পাওয়ার উপায় নেই। এত পাহারা চতুর্দিকে। সদা সর্বদা কিরণের সাকরেদরা ঘুর ঘুর করছে কাছে। গলা টিপে দেবে যে, সে উপায়ও নেই। মেয়েটাকে রাখেই না মোটে। দুধ খাওয়ানোর জন্য আনে কেবল। বাদ বাকি সময় কিরণের সাকরেদের কোলে বুকে।

ইরাবতী মরার সুযোগ পায়নি নিজে। কিরণকে মেরে ফেলারও না। মেয়েটার নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে কিরণের উপর নৃশংস প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। হলনা। নিজের কপাল নিজেই চাপড়ায় ইরাবতী।

মেয়ের ওপর মা যে নির্দয়—এটা কিরণ বুঝেছিল। মেয়েটাকে সেই জন্যেই যে, সরিয়ে সরিয়ে রাখত শুধু, তা নয়। আরো একটা কারণ ছিল। ইরাবতীকে রূপের বেসাতিতে নামানো।

নামতে না চাইলে কি হবে—নামতে বাধ্য হয়েছে ইরাবতী। সময় নেই অসময় নেই, লোক আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। মুখ বুজে রূপ-

যৌবন বিকিয়ে দিতে হয়েছে প্রত্যেককে। দুর্বিষহ বহুবল্লভার জীবন সইতে হয়েছে তাকে দিনের পর দিন।

রূপের সায়র ছেঁচে যে মেয়ে পৃথিবীতে এসে গরলভরা পুরুষের খপ্পরে পড়েছে, সে মেয়ের রূপ মুছে না যাওয়া অবধি মুক্তি নেই কি? মৃত্যু নেই কি? কথাগুলো জপের মন্ত্রের মতো ইরাবতীর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বেজে উঠত অহর্নিশি।

রূপ থাকতেই মুক্তি পেল একদিন ইরাবতী আকস্মিকভাবে।

কিরণ খুন হল।

ইরাবতীকে নিয়েই ঘটনা। নতুন অতিথিরা টাকাপয়সা না দিয়েই পালাচ্ছিল। কিরণের চেয়েও দুর্দান্ত শক্তিমান ওরা। ওদের সঙ্গে মন কষাকষি ছিল গোড়ায়। কিরণ ভেবেছিল, ইরাবতীর রূপের জৌলুসে ঝগড়া মিটে যাবে বরাবরের জন্য। আর কিরণ ও দলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়াবে। মেয়েটার লোভও দেখাতে ছাড়েনি, বড় হলে সরাবের পিপেয় ডুবে থাকার পয়সার অভাব হবে না কারো বুড়ো বয়সে।

বুদ্ধিতে ওরা কিরণের চেয়ে এককাঠি ওপরে গেল। চিরকালের জন্য সরিয়ে দিল কিরণকে দুনিয়া থেকে।

নিজেদের মধ্যে দুদলে মারামারি-হানাহানি শুরু হয়ে গেল। মেয়েকে নিয়ে পালাল ইরাবতী। মেয়েটা চারে পা দিয়েছে সবে। রেখে গেলে, ভবিষ্যতে দশা হবে তার মতো। তার চেয়ে এ মেয়েকে নিজে যমের হাতে তুলে দেবে সে ভালো।

আবার রাত্তিরের রাস্তায় একা ইরাবতী।

ঠিক একা নয়, মেয়েটা আছে। মেয়ে নিয়ে যতখানি সম্ভব, পা চালিয়েই চলছে। চারদিকে তাকাচ্ছে চনমন করে। কেউ আসছে কিনা, কেউ দেখছে কিনা। না, আসবে আবার কে? ওরা তো নিজেদের নিয়েই নিজেরা মত্ত এখন। চলছে চলছে চলছে।

কাহানগড় গাঁয়ের কাছ বরাবর এসে থমকালো।

ভেসে আসছে গান। গম্ভীর গলা, সুমিষ্ট সুরেলা। এতদিনের

অশান্ত মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুমের আমেজ আসছে চোখে। জহানকে নিয়ে বসে পড়ল বাবলাতলায়। ভয়ডর পালিয়ে যাচ্ছে মনের কোন থেকে। মায়ের কোলে মাথা রেখে ক্লান্ত জহান ঘুমিয়ে পড়ল।

পূবদিকের বাড়িটার দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে কে যেন পায়চারি করছে ঘরের ভেতর। মূর্তিটা ছায়া মতো দেখাচ্ছে। আসলে মানুষ চোখে পড়ছে না, পড়ছে তার ছায়া। ছায়াই মুখ নাড়ছে, গান গাইছে।—ত্বম অস্মাকম তবস্মসি। আমি তোমার তুমি আমার। কি সুন্দর কথা। ছোটবেলায় বাবা যখন সুর করে পাঠ করতেন, মানে বুঝতো না ইরাবতী ঋগ্বেদের এই পুণ্য শ্লোকের। পরে, বাবাই মানে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবার সঙ্গে সেও কতবার গেয়েছে গলা মিলিয়ে।

সে সব একদিন গেছে। ইরাবতীর চোখ ভরে জল এলো।

আমি কার? যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার।

তিনি কার? যাকে সৃষ্টি করেছেন, তার।

বহুদিন পর ভাবতে ভালো লাগছে সে কথা। ইরাবতীর নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছে। ভুলে গেল।

এরকম নিজেকে ভুলে কতক্ষণ ছিল, জানেনা। কখন গান থেমেছে, কখন ত্রিলোকস্বামী কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাও না। ওঁর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল।—এত রাত্তিরে এখানে কে? বারান্দায় বেরোতে ওঁর লক্ষ্য পড়েছে বাবলাতলায়। সন্ন্যাসী ত্রিলোকস্বামী এসে হাজির হয়েছেন।

ইরাবতী মুখ তুলে তাকাল।

মুণ্ডিত শির সৌম্যমূর্তি করুণাঘন চোখ। পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, খালি পা। বয়েস হয়েছে। কত বোঝা যাচ্ছে না। ঋজু দেহ। মনে পড়ছে বাবার সঙ্গেই এখানে—এঁর কাছে এসেছিল আগে। বছর বারো বয়েসে। বিয়ে হয়নি তখনো। ইরাবতী বিস্ময়াবিমূঢ়। নিজের

অগোচরে কেমন করে এসে পড়ল এঁরই কাছে। ইরাবতীর আর কোন ভয় নেই।

পরিচয় দিয়েছে ইরাবতী।

নিজের আদ্যোপান্ত অকপটে বলেছে।

আশ্রয় পেয়েছে ভবানীর পূজারী ত্রিলোকস্বামীর কাছে। মায়ের পূজারী ছোটবড় সব মেয়েকে জগন্মাতার প্রতিমূর্তি ভাবেন। বারবিলাসিনীও তাঁর কাছে পূজনীয়া। মাতৃশক্তি এদের মধ্যেও তো আছে। পুরুষ ভোগের বস্তু হিসেবে দেখে বলে, ভেতরের আসল রূপটা নজরে পড়ে না।

এই মাতৃসাধকই ইরাবতীকে জানাশোনা লোকের কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন পরে। পিতৃমাতৃহীন দুটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হবে মাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়ে। বুড়ো ঠাকুর্দা এমনই একজন স্ত্রীলোক খুঁজছিলেন। ছেলেমেয়ে দুটি নেহাৎ শিশু নয়। ছেলেটির সাত চলছে, মেয়েটির আট।

মালিকের নাতি-নাতনীর দিকে যত লক্ষ্য ছিল ইরাবতীর, নিজের মেয়ে জহানের ওপর তত লক্ষ্য ছিল না। জহান হেলায়ফেলায় মানুষ হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর্দার নাতিনাতনী দলজিৎ আর বীরা ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। জহান না হলে ওরা খেলবে না খেতে বসবে না ঘুমোতে যাবে না। ওরা ছায়ার মতো ঘিরে রাখে জহানকে।

দিন যায় রাত যায়। চলে যায় ওদের ছেলেবেলা, চলে যায় কিশোর বয়সের দিনগুলো এক এক করে। আসে যৌবন আসে উন্মত্ত উল্লাস। যৌবন কারো বাধা মানে না, শাসন শোনে না। হয়ে ওঠে উদ্ধত-অবাধ্য। দলজিৎ উনিশ, বীরা বিশ আর জহান ষোলোয় পড়েছে।

ওদের নিয়ে ইরাবতীর পাগল হবার উপক্রম। কারো খাওয়ার ঠিক নেই। শোবার ঠিক নেই। বাড়িতে থাকারও না। ঠাকুর্দা

মৃত্যুর সময় ইরাবতীর ব্যবস্থা করে গেছে যাবজ্জীবন থাকা-খাওয়ার। মৃত্যু অবধি এই বাড়িতেই থাকতে হবে। নিজের মা যা পারে না, তার চেয়ে ইরাবতী ঢের বেশী করেছে। দলজিৎ, বীরার পূর্বজন্মের মা ছিল ও নিশ্চয়।

বীরা-দলজিৎ মা বলতে অজ্ঞান ইরাবতীকে। মা বলে যখন ডাকে ওরা, ইরাবতীর ভেতরটা একটা আনন্দে ভরে যায়। ইরাবতীকে মনে হয় সত্যিসত্যিই ওদের মা সে। কিন্তু আশ্চর্য জহানের বেলায়। এ আনন্দের এককণাও পায় না। মনটা বিষিয়ে ওঠে আরো। ও জহান্নম ও নরক। কিরণ যেন নতুন করে মনের আঙিনায় তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দেয়। আনন্দের নির্মল ফুল ওর পায়ের চাপে দলে পিষে মিলিয়ে যায় নিমেষে।

আকাশের সূর্য অনন্ত, পৃথিবীর পাঁক কিরণ। কোথায় সূর্য আর কোথায় পাঁক। ইরাবতী আকাশ থেকে সূর্যকে টেনে পাঁকে ডুবিয়েছে।

কিরণের মেয়ে জহানের বাবার পরিচয়ে স্কুল-কলেজে অনন্তর নাম লিখিয়েছে। স্ত্রী হয়ে মৃতস্বামীর আত্মার সঙ্গে এর চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করার আর কি আছে? ঠাকুর্দার কাছে ইরাবতী লুকোয়নি কিছু। এ মতলব দিয়ে এ কাজ করিয়ে গেছেন তিনিই। তিনি বলেছেন, দোষ নেই এতে। যার ক্ষেত্র তার পুত্র—জবালা সত্যকাম তো তার প্রমাণ। আবার অন্যের ঔরসে হলেও স্বামীর পুত্র হিসেবে পরিচিত—পঞ্চপাণ্ডবকেই দেখা যায়।

অকাট্য যুক্তি থাকলেও ইরাবতীর মনে কাঁটা বেঁধা যন্ত্রণা লেগেই আছে। অনন্ত অনন্ত, কিরণ কিরণ। এটা ঠিক হচ্ছে না।

কেন জানেনা একটা দুশ্চিন্তা অনবরত মাথার মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছে। মেয়েটা না কিরণের প্রকৃতি পায় শেষে, উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে ওঠে। দুশ্চিন্তা সত্যি হতে চলেছে এখন। মেয়েটার ওপর লক্ষ্য পড়েনি আগে। এখন লক্ষ্য পড়েছে। মেয়েটা যা কাণ্ডকারখানা করছে লক্ষ্য না পড়ে উপায়ও নেই কারো। এদিকে রূপ তো নয়—

আগুনের লকলকে শিখা একটা। কাকে কখন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে, তার ঠিক নেই। ওই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটে আসছে কত যুবক। ওকে ঘিরে মত্ত তারা। ও-ও তাদের ঘিরে পাগলপারা।

সকলে সামাল সামাল। জহানের হাত থেকে নিজেদের, ছেলেদের বাঁচানো যায় কি করে? রাস্তাঘাটে ইরাবতীকে কোন ছেলের মা দেখতে পেলে ছেড়ে কথা কয় না। ব্যঙ্গবিদ্রূপের তুবড়ি ছোটে। ধিঙ্গি মেয়েকে শাসন করবে কেন? তৈরি করেছে তো ছেলেদের মাথা খাওয়ার জন্য। ত্রিভুবনে অমন রূপসী যেন আর কেউ নেই ওর মেয়ের মতো। রূপ দেখানোর জন্য মেয়েকে ছেড়ে রেখে দেয়।

কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসে ইরাবতী বাড়িতে। দাঁতে দাঁত চেপে একলা ঘরে বসে, বাইরের লোকের অপমানের প্রতিশোধ নেয় মেয়ের অনুপস্থিতিতে মেয়েকে গালাগালি করে।— মরণ আর কি। মরুক মরুক মরুক। হাড় জুড়ুক সবার।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে জহান। ইরাবতী চমকে ওঠে। অবাক চোখে দেখে, মেয়ের সাজপোশাক। জরির চটি শালোয়ার-কামিজ ওড়না। জরির চুমকি দেয়া গোলাপী ওড়নায় মুখ ঢেকে, হেসে কুটিকুটি। পলকে এলো পলকে চলে গেল বিদ্যুৎ চমকের মতো।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। এক দঙ্গল ছেলে পেছনে। হীর-রাংঝার গানের একটা কলি গেয়ে উঠল গলা ছেড়ে —ও মাহী রাংঝাটেয়া সাঁইয়া ওয়ে। পরের কলিটা ছেলের দল গেয়ে উঠল একসঙ্গে।

– খেড়ে ল্যায় চলে ডোলিয়া সাঁইয়া ওয়ে।

এবার জহান আর জহানের রূপমুগ্ধরা সকলে মিলে জোরে হেসে উঠল বাড়ি কাঁপিয়ে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল ইরাবতী দড়াম করে।

হীরের গান মুখে উচ্চারণ করতেও লজ্জা করে না। হীরের মতো কটা মেয়ে হ্তে পারে ? রাংঝা ছাড়া জগতের কিছুই জানত না সে। কি বিশুদ্ধ প্রেম। খেড়ে যখন ডোলি করে নিয়ে যাচ্ছে, তখনো কেঁদে কেঁদে ডেকেছে রাংঝাকেই। তুমি কোথায়। এসো, নিয়ে যাও আমাকে।

এই গানে হাসিমস্করা। নির্বোধ আর কাকে বলে। জহান হীর হয়েছে ? ছেলেরা কি রাংঝা নাকি ? মৃত হীরের বুকের ওপর ছোরার ঘায়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল রাংঝা। এদের স্পর্ধার সীমা-পরিসীমা নেই। শয়তান-শয়তানী সব। রাগে ফুঁসেছে ইরাবতী নিজের মনে।

তিতিবিরক্ত হয়ে পড়ে জহান।

চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের অতৃপ্তি। সারাক্ষণই শাসন। এ করোনা ও করোনা, এর সঙ্গে মিশোনা ওর সঙ্গে মিশোনা এখানে যেওনা ওখানে যেওনা। কেন ? উত্তর নেই। সেখানে নীরব। বলতেই হবে— পেড়াপীড়ি করলে, একটিমাত্র জবাব -- পরে সমস্ত বলবো।

জহানের এ হেঁয়ালি মোটেই পছন্দ নয়।

মায়ের যত আক্রোশ শ্যামলালের ওপর! ওকে দেখলেই জ্বলে যায়। ছু'চক্ষের বিষ একেবারে। ওর সঙ্গে কোথাও গেলেই বলবে, জহান আমার ভয় করে।

—ভয়টা কিসের ?

—বলতে পারছি না।

—তোমার কথার কোন মাথামুণ্ড বুঝিনা আমি। নেই কারণ, নেই যুক্তি। কারণ না বললে, আমি কোন কথাই শুনবো না। নিপাট ভালো ছেলে শ্যামলাল।

—কিরণকেও ওই রকম ভালো ছেলে দেখাত।

—কে কিরণ ?

নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দ্রুতপায়ে ইরাবতী। যাওয়ার সময় বলে যায়, তুই চিনিসনা। আমি দেখেছিলাম একটা ছেলেকে।

—কে ছেলে ? কি করেছে ? বলে যাও। জহান চিৎকার করে ওঠে। ততক্ষণে ইরাবতী পালিয়ে বেঁচেছে। ও ঘরে গিয়ে দরজায় কুলুপ এঁটে দিয়েছে ভেতর থেকে। তারপর মেঝেয় সতরঞ্চির ওপর বসে বসে ভেবেছে, ভুল করছে, না ঠিক করছে ইরাবতী ? বেঠিকই বা বলে কেমন করে ? শ্যামলালের চালচলন হাসি-কথা অনেকটা কিরণের মতো। জহানকে দেখলে যেমন কিরণকে মনে পড়ে, ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারে না, তেমনি শ্যামলালকে দেখলেও। অন্য ছেলে জহানের রূপের আগুনে জ্বলতে আসে। ওদের পাগল করা জহানের একটা খেলা, একটা নেশা। জহানের খপ্পর থেকে ওদের টেনে বার করতে হবে।

ত্রিলোকস্বামী ইরাবতীকে বলেছে, তুমি মা। সবার মা। সবার মঙ্গল কামনা করাই ধর্ম। ইরাবতী দোটানায় পড়েছে। মেয়েও তার জীবন পাক, কিরণের মতো ছেলের হাতের পুতুল হয়ে থাকুক—এটাও চায় না। কি করে দুদিকের সমাধান করবে ?

সময় সময় ইরাবতীর মনে হয়েছে, মাথাটা খারাপ হয়ে যায়নি তো ?

পরখ করার জন্য গেছে হোরিখেলার মাঠে। গেছে সাঁঝ সন্ধ্যেয় গেছে জ্যোৎস্না রাতে গেছে শ্রাবণের বাদল ঝরা ভোরে। গাছের আড়াল থেকে একই দৃশ্য দেখেছে। ভাঙা ইঁদারার পাড়ে বসে আছে দুজনে। জহান আর শ্যামলাল। কাউকে ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজেদের ছাড়া নিজেদের দুনিয়া ছাড়া অন্য লোককে চেনেনা ওরা। চিনতে চায়ও না। পরিচিত লোক চোখের সামনে দিয়ে গেলেও, অচেনা অজানা। আশ্চর্য ব্যাপার।

অন্য ছেলেরা তো গোল হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে। জহানের মুখের

দিকে অপলক দৃষ্টি। জহানের হাসি ওদের ঠোঁটের কোণে ছোঁয়া লাগছে। জহান ক্রোধের ভাণ করল, ওরা পিট পিট করে তাকাচ্ছে।

ওদের অজ্ঞাতে ওদের মধ্যে রেষারেষির বীজ পুঁতে চলেছে জহান। সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল হোলির দিন দুপুরে। একই সময়ের মধ্যে পর পর দুতিনটে ঘটনা ঘটে গেল।

ইরাবতীর হৃৎকম্পের সঙ্গে পায়ের তলায় ভূমিকম্প হতে লাগল। ওর সম্বন্ধে যা ভেবেছ তাই। মাথার গোলমাল হয়নি ইরাবতীর। সত্যিই জহান কালনাগিনী। সর্বনেশে মেয়ে!

হোলিখেলার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে সবাই। লোকে লোকে ভরে গেছে গোটা মাঠ। জওয়ানদের উৎসব। লাঠি খেলছে, তলোয়ার খেলছে ওরা। লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি। খটাখট আওয়াজ উঠছে বাতাসে। একজনের আঘাত রুখছে অন্যজন বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে কখনো শুয়ে। তলোয়ারের ঝন ঝন শব্দেও ওই একই দৃশ্য। আঘাত হানা আর আত্মরক্ষা। আবার একজনকে একসঙ্গে গোল হয়ে ঘিরে বহুজনের আক্রমণও চলছে।

জওয়ানদের মাথায় নানা রঙের পাগড়ি। লাল হলুদ নীল পাঁচরঙা সাদা। পায়ে নাগরা জুতো। পরনে লুঙ্গি-পাজামা পাঞ্জাবী। লাঠিখেলা তলোয়ার খেলার সঙ্গে সঙ্গে বীর নৃত্যের তাল চলছে ওদের বলিষ্ঠ পায়ের তালে তালে। রাজ্যের বসন্ত উৎসব বসন্ত ঋতু এই মাঠেই এসে উপস্থিত হয়েছে বুঝি। পৃথিবীর সমস্ত যৌবন এক হয়েছে এখানে। যৌবনের তরঙ্গ দুলে দুলে উঠছে মাঠের বাতাসে গাছের সবুজে। আবেগে পাতা কাঁপছে থরথর করে। সাদা ধুলো উড়ছে মেয়েদের ওড়না খুলে দিয়ে বিনুনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ওদিকের তলোয়ারের ঝনঝনানি শব্দটা কানে এসে বাজল বড্ড জোরে। চমকে উঠে ইরাবতী চোখ ফেরাল এদিক থেকে ওদিকে। নজর পড়ল জহানের ওপর। রণমূর্তি। দুহাত দিয়ে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে।

চতুর্দিক ঘুরে জওয়ানরা ওকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কাছে কেউ এগিয়ে গেলেই মুখ টিপে হাসছে জহান। হাসির সম্মোহনী শক্তি এমন, যুবকটি সরে আসছে। সেই অবসরে অল্প হলেও বাহুতে আঘাত হানতে ছাড়ছেনা জহান। ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। পৈশাচিক উল্লাসে জহান অট্টহাসি হাসছে। এইভাবে আটটি জওয়ানের একই দশা হ'ল। যুবকেরা ক্ষত স্থানে হাত চেপে ধরে চুমু খাচ্ছে আর জহানের দিকে তাকিয়ে হাসছে। পরাজয়ে পরিতৃপ্তির হাসি।

আঘাতের যুদ্ধ থেকে কেবল একজনকেই জহান বাদ দিল। শ্যামলালকে। অসিযুদ্ধের খেলায় নামার আগে ভাঙা ইঁদারার পাড়ে বসিয়ে দিয়ে বলেছে, তুমি নেমোনা। যুদ্ধে হেরে গেলে—বিশেষ করে এত লোকের সামনে—আমি মরমে মরে যাবো। বিয়ে করতে পারবো না আর তাহলে তোমাকে।

তলোয়ার খেলা শেষ করে শ্যামলালের কাছে এসে দাঁড়াল। শ্যামলাল উঠল। দুহাত বাড়িয়ে দিল। খুশী উপচে পড়ছে চোখে মুখে। হাত ধরেছে জহান। ঠিক সেই মুহূর্তে ইঁদারার ভাঙা পাড়টা ধসে পড়ল হুড়মুড় করে। বসলে, জীবন্ত সমাধি হত দুজনের।

নতুন ধরনের খেলা শুরু হল আবার।

এবারে শ্যামলাল আর জহানের দর্শকের ভূমিকা। এবারেও শ্যামলালকে যেতে দিল না জহান। আটকাল। বলল, রগড়টাই দেখনা। তুমি গেলে হবে না। জহানের কথা ঠেলে কার সাধ্যি। এমন পুরুষ নেই এখানে একটিও। জহানকে হারানোর ভয়ে, জহানের অমতে চলতে সাহস করে না কেউ। পাছে বিরূপ হয়।

প্রত্যেকেই ভাবে জহানের কৃপা দৃষ্টি তার ওপর। এমন হাসি এমন চাউনি এমন মায়াজাল বিস্তার করার ক্ষমতা জহানের মানুষের ওপর। ওর মুখের কথা খসলে, ওর জন্য হাসতে হাসতে মরতে পারে যে কেউ। জহানকে নিয়ে যুবকদের তলোয়ার খেলায় ইরাবতীর সে অভিজ্ঞতা হয়েছে একটু আগে। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনির খেলা এটা।

খেলার ছলে প্রত্যেকের রক্ত দেখে তবে তৃপ্তি পেয়েছে রাক্ষুসী। হাসিতে বুকের রক্ত জল হয়ে গেছে ইরাবতীর। কিরণ যখন হাসত ঠিক ওই রকম। ওই রকম পিশাচের মতো।

শ্যামলাল ছেলেটা কি চতুর। ইদারার পাড় ধ্বসে পড়ার মুখে হ্যাঁচকা টানে খানিক তফাতে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওকে ঠিক। কিন্তু এ ধরনের মানুষরা প্রাণ বাঁচায় নিজেদের অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কিরণ ইরাবতীকে আশ্রয় দিয়েছিল, কারণ ছিল। নিজের সম্পদের থলি ভারী করে তোলার জন্য। একটা কিরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও আর দুটো কিরণ জেঁকে বসেছে তার মনে। শ্যামলাল জহান, জহান শ্যামলাল।

তলোয়ারের ঝনঝনানিতে সচেতন হয়ে উঠল ইরাবতী।

একজন এসে একটা তলোয়ার জহানের হাতে তুলে দিচ্ছে। সেই তলোয়ারে চুমু খেয়ে জহান তুলে দিচ্ছে আবার তারই হাতে। আনন্দে নেচে উঠছে তরুণ। দলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বীরবিক্রমে। যেন বিশ্বজয়ী হয়ে এসেছে সে। তার সমকক্ষ নেই আর দ্বিতীয়টি। ঠনঠান শব্দ হতে হতে ঝনাৎ-ঝনাৎ শব্দে মুখর হয়ে উঠল আকাশ। আবার নতুন আসছে জহানের কাছে, আগের রীতি পালন করছে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে দলেব মাঝে।

অসহ্য, অসহ্য। দেখা যাচ্ছে না এসব। জহানের মাথায় খুন চেপেছে নিশ্চয়। যুবকদের মাথায়ও। জহান চিৎকার করে বলছে, হারলে চলবে না, হারলে চলবে না।

ওরা মরণপন করে লড়ছে। খেলা নয়, সত্যি সত্যিই লড়াই। জিতে কে প্রিয়পাত্র হবে জহানের। একসময় জহান যার তারিফ করেছে—রূপের কি শক্তি—ছলনাময়ীর সেটা যে নিছক ছলনা—বোঝেনি ওরা—প্রতিদ্বন্দ্বী শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ওরা।

সকলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ঝুঝিয়ে রক্ত ঝরছে। দেখতে পারল না আর, চুপ করে থাকতে পারল না আর। আর্তনাদ করে উঠল। এদের বাঁচাও! এদের বাঁচাও।

মাঠসুদ্ধ লোকের চোখ ফিরল এদিকে। দৌড়ে এলো সকলে। মৃত্যুখেলা বন্ধ হল। মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল জহানের। বিষণ্ণ ছায়ায় ছেয়ে গেল। বাধা পড়েছে তৃপ্তিতে।

হঠাৎ বিষাদ নেমে এলো হোরিখেলার মাঠে। ঘরমুখো পা বাড়াল এক এক করে সকলে। শ্যামলাল জহানও মাঠ ছেড়ে চলে গেল। আকাশ পাতাল ভাবনা ইরাবতীর মাথার ভেতর দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। ধড় থেকে মাথাটা খসে পড়ে বুঝি। আর দেরী করলে বিপদের একশেষ। করার কিছু থাকবে না তখন। এমনিতেই অনেক সময় চলে গেছে। সব দেখে শুনেও ইরাবতী যদি এখনো কোন ব্যবস্থা না করতে পারে, পরে আপসোসের অন্ত থাকবে না তার। বাড়ি ফিরে আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।

বিমর্ষমুখে ইরাবতী বাড়ি ফিরে এলো।

ঘরে। চারপাইয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যের ফিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে। আসছে রাত্তির। যম যাতনার রাত্তির। মেয়ে বাড়ি ফেরেনি এখনো। একটা পথ পাওয়া যাচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ভাসছে···।

এটা সাংঘাতিক পথ। জহানকে খুলে বলতে হবে সমস্ত। এতেই একমাত্র বাঁচতে পারে জহান। শ্যামলালের অন্ধ মোহ কেটে যেতে পারে ওর। ওর মোহমুক্ত হতে পারে অন্য ছেলেরা। জহানকে ডেকে নিভৃত বলতে বাধ্য হবে আজ। এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই কোন।

ফেরার পর থেকে ইরাবতী আলো জ্বালেনি ঘরে। জানলা দিয়ে তকতকে আকাশ থেকে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়ছে মেঝেয়। কানখাড়া করে শুনছে ইরাবতী জুতোর হিলের খটখট শব্দ। জহান আসছে।

এলো জহান।

ঘরের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির ধাপে পা দিতে যাচ্ছে, ইরাবতী ডাকল—বিশেষ দরকার। একবার এ ঘরে এসো তুমি।

আসতে চাইল না জহান। বলল, আজ রাত হয়ে গেছে। দরকার হ'লে বোলো কাল সকালে।

ইরাবতীর তীব্রতীক্ষ্ণ কণ্ঠ—দরকারটা আমার এখুনি। কাল সকালে নয়।

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে প্রবেশ করল জহান। সামনের জল চৌকিটার ওপর বসে বলল, শীগগির শীগগির, দেরী করলে চলবে না।

—জীবন নিয়ে খেলা, মরণ বাঁচনের কথা। অত ছটফট করলে হবে কেন? স্থির হয়ে বসো।

জহানের বাঁ-পার ওপর ডান-পা রাখা ছিল! নাড়াচ্ছিল। থামাল। পা নামাল। দু-হাঁটুর ওপর দু-কনুইয়ের ভর রেখে, গালে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল মায়ের মুখের ওপর। ঘরখানা আলো আঁধারি। আদিম যুগের কোন গুহার মধ্যে বসে আছে যেন মা-মেয়ে। আদিম পাপের কথা বলছে মা। মেয়ে শুনছে। অজানা অনেক গোপন কথা বলছে মা লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর কিভাবে কিরণের কাছে এসে পড়ল···কিভাবে কিরণ পাপের পসরা মাথায় তুলে দিল। প্রতিদিন দেহের বেসাতির জন্য কত না নির্যাতন সইতে হয়েছে···

পাথরের প্রতিমূর্তির মতো বসে শুনছে জহান। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে। গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে টসটস করে।

ইরাবতী বলেছে কোন পুরুষকে বিশ্বাস করি না আমি। আমার মতো তোমার জীবন হোক—এটা চাই না আমি। এটা কিছুতেই হতে দোব না আমি।

জহানের মাথাটা কিরকম করে উঠেছে। মা কি বলতে চায়?

মা কি বলতে চায় বুঝেছে জহান। শুনে অন্ধকার দেখছে চতুর্দিকে। মায়ের কথা ছোরার চেয়েও ধারাল। জহানের হৃৎপিণ্ডটা ফালা ফালা করে দিল যে। সব ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলুক দুঃখ নেই। শ্যামলালকে ছাড়বে কেমন করে? মরে গেলেও পারবে না। শ্যামলালকে কিরণ দেখছে—মায়ের ভুল।

ধরাগলায় জহান বলল, একথা রাখতে পারব না আমি। অন্য ছেলেদের মন নেই, ওদের সঙ্গে আমি খেলা করি, ভালবাসি না। শ্যামলালের মন আছে ওকে আমি ভালোবাসি।

বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল ইরাবতীর কপালে। কথায়ও বিরক্তি ঝরে পড়ল।—কেমন করে জানলে—মন আছে?

— ও এখনকার মতো নয় ভালোবাসার নামে ভালোবাসার অভিনয় করে না। আগেকার হীর-রাংঝা লয়লা-মজনু ওর মনে বাসা বেঁধে আছে ছোটবেলা থেকে। ঠাকুরমার মুখে গান শুনেছে কাহিনী জেনেছে। কখনো নিজেকে রাংঝা ভেবেছে, কখনো মজনু। কল্পনায় হীরকে খুঁজছে, খুঁজছে লয়লাকে।

— তুমি কি তার সেই হীর-লয়লা নাকি? ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ফেটে পড়েছে ইরাবতীর গলা।

—হ্যাঁ, আমার মধ্যে ওর কল্পনার জিনিস পেয়েছে।

—পরীক্ষা করে দেখেছো, না হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছো? যারা এরকম বলে, তারাই বেশী শঠ। আমাদের আমলে রাংঝা-মজনু পেলাম না, আর এই আমলে তুমি পেলে? কিরণও কম মহৎ সাজেনি আমার কাছে।

—আমি বলছি এ কিরণ নয়। তুমি ভুল করছো মা। এক-আধজন শয়তান বলে দুনিয়ার সব পুরুষ শয়তান হয়ে যাবে? এ কেমন কথা। তোমার যুক্তি আমি বিশ্বাস করি না। আমি মানবো না। ওকে ছাড়ার কথাই ওঠে না। যদি আমি মরি, আর তখন তুমি বেঁচে থাকো, দেখবে ও বেঁচে নেই। আত্মঘাতী হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

ইরাবতী হেসে উঠল জোরে। তারপর ধমকের সুরে বলল, অত ভাবুক হলে এ পৃথিবীতে বাঁচা চলে না। চোখকান খুলে চলতে হবে। ওসব ভাবের কথা ছাড়ো। তোমার জন্মের কথা শুনলে নেবে ও?

—নেবে। ওর ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। অতি উদার। সমুদ্রের মতো দরাজ বুক।

—থামো। অত কাব্য করতে হবে না। শক্ত মাটির ওপরে হেঁটে চলো আগে। এ বয়েসে অনেকে অমন রঙিন স্বপ্ন দেখে। সব স্বপ্নই মিথ্যে হয়ে যায় ভবিষ্যতে।

উঠতে যাচ্ছে জহান,ইরাবতীর একটা কথায় বসিয়ে দিল।—যাচ্ছো কোথা? আসল কথা বলা হয়নি তোমায়। ভেবেছিলাম চেপে যাবো। হল না। তুমি নিজে ছাড়বে শ্যামলালকে বাঁচানোর জন্য। তুমি দুঃখ পাবে বলে বলিনি। শ্যামলালকে ছাড়তে বলছি কেন – তার প্রকৃত কারণ বলছি। আমি জানি, তুমি শ্যামলালকে ভালোবাসো, শ্যামলালও তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই ওকে বাঁচানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সত্যিই আমি খুব খুশী হতাম। সে হবার নয়। কারো সঙ্গেই বিয়ে হতে পারে না তোমার।

জহান কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। মায়ের মুখে স্থির দৃষ্টি আটকে আছে। দেখছে মায়ের লালচে মুখে নীলের ছোপ ধরেছে যেন। ইরাবতীকে বড্ড অবসন্ন দেখাচ্ছে

উঠে দাঁড়াল ইরাবতী।

হাঁটুমুড়ে বসল মেঝেয়। মাথা নীচু করে চারপাইয়ের তলাটা দেখে নিল একবার। দু-হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে, বুক ভরে লম্বা নিশ্বাস টেনে নিল একটা। তারপর কি যেন কি ভাবল একটু। মেয়ের দিকে তাকাল। তাকিয়ে রইল খানিক। মাথা নুইয়ে চারপাইয়ের তলা থেকে বেতের বাক্সটা টেনে বার করল। বাক্সটা বেশ বড়সড়।

চাবি খুলল। পোশাক চাপা যে বস্তু ছিল, বার করে জহানের সামনে তুলে ধরতে, বুকের রক্ত জল হয়ে গেল জহানের। বিষ ভর্তি শিশি একটা। ভয় হল জহানের। মত খাটল না জেনে গলায় ঢেলে দেবে না তো? বলল, দেখি! হাত বাড়াল। নিয়ে নেবে।

ইরাবতী হাসল। বিষণ্ণের হাসি। বলল, ভয় নেই। খেয়ে মরবো না। মরার ইচ্ছে ছিল যখন তখন সুযোগ পাইনি। এখন প্রয়োজন নেই। এ বিষেরও না আর মরারও না। তোমাকে খাবারের সঙ্গে খাইয়ে

দিয়ে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু সে গুড়ে বালি। এর এক ফোঁটাতে মানুষের প্রাণ যায়, এরকম শত শিশি খাওয়ালেও তোমার কিছু হবে না।

—কেন? অস্ফুটে বেরিয়ে এলো জহানের মুখ দিয়ে।

—তুমি বিষকন্যা?

—সে কি? জহানের গলায় বিস্ময় ঠেলে ঠেলে উঠছে।

—'পরিশিষ্ট পর্বণ' পড়নি? মন্দরাজা বিষকন্যা তৈরী করে ছিলেন। তাকে পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তকে মেরে ফেলার জন্য।

—হ্যাঁ পড়েছি। তবে সত্যিই কি বিশ্বাস করা যায় এখনো?

—হ্যাঁ, তুমি তার সাক্ষী। এই বিষ তার সাক্ষী। এ শিশির বিষটা আর খাওয়াতে হয়নি তোমায়। রেখে দিয়েছি। আর প্রয়োজন নেই। তোমার সারা শরীর বিষে জরজর। পাঁচ বছর বয়েস থেকে অল্প মাত্রায় দিতে দিতে পুরো শিশি দিয়েও কিছু হত না তোমার। কিছুদিন আগে পর্যন্তও দিয়েছি খাবারের সঙ্গে। বিয়ে করলে, যেই তোমার স্বামী হোক, তার মত্যু অনিবার্য। স্বয়ং বিধাতা এলেও রোধ করতে পারবে না।

—এ সর্বনাশ কেন করলে তুমি?

—আমার জীবনের প্রধান পাপ কিরণ। আর সেই পাপের রক্ত জহান। পাপকে সরাতে চেয়েছিলাম দুনিয়া থেকে। কিরণের বাড়িতে পারিনি। এখানে এসে যোগাড় করেছিলাম বিষ। দুধের সঙ্গে বেশী করে মেশাতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। নেপথ্য থেকে বিধি বোধ হয় হাসল। আচমকা মনে পড়ে গেল যাত্রার কথা। চন্দ্রগুপ্ত-যাত্রা দেখেছিলাম একবার স্বামীর সঙ্গে। বিয়ের বছর দুয়েক পরে।

বিষকন্যাকে পাঠালেন পরাজিত মহারাজ নন্দ। মন্ত্রী চাণক্য বুঝতে পারলেন সমস্ত। চন্দ্রগুপ্তকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। বিষকন্যা থেকে দূরে দূরে থাকতে। বললেন, ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত।

কাছে দাঁড়িয়েছিল পর্বতেশ্বর। বিষকন্যার রূপ দেখে কামনার আগুন জ্বলে উঠল ভেতরে দাউ দাউ করে। উন্মত্ত হয়ে উঠল বিয়ে করার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য। এক দণ্ড তরসইছে না আর।

চাণক্য মৃদু হাসল। বিয়ে দিতে রাজী হ'ল। নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ জেতার পর পর্বতেশ্বর রাজ্যের অর্ধেক অংশ চাইছে। দিতে হবে। ওর মৃত্যু হ'লে নিষ্কণ্টক হবে চন্দ্রগুপ্ত। পুরো রাজ্য তার একারই।

পর্বতেশ্বরের আকাঙ্খা পূরণ করল চাণক্য।

বিয়ে হল, কিন্তু প্রাণে বাঁচল না আর পর্বতেশ্বর। মৃত্যুর সময় বলে গেল, সারা শরীর বিষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, গলা অবধি বিষ গিলেছি আমি।

বলা শেষ হ'ল ইরাবতীর। মেয়েকে দেখানোর পর বিষের শিশিটা মুঠোয় পুরে রেখেছিল। বাক্সর ভেতর রাখল। মেয়ের মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে।

জহানেব মুখখানা ঘামে জবজবে হয়ে উঠেছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। বিস্ফারিত চোখ। বিড়বিড় করে বলছে, আমি বিষকন্যা আমি বিষকন্যা…।

সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। নিজের হাত নিজের নয় নিজের পা নিজের নয় নিজের দেহ নিজের নয়। টলছে, পড়ে যাচ্ছে। ইরাবতী ধরে ফেলল। জ্ঞান হারিয়েছে জহান।

উঠে পড়ল জয়মালা চারপাই থেকে। সুধা এলো না, আসছে না। রাত বাড়ছে। অন্ধকার ঘরে ভূতের মতো বসে থাকা যায় না। আলো জ্বালল। উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে রাত বাড়ার সঙ্গে। জানালায় উঁকি মেরে বাইরে দেখল, দরজায় উঁকি মেরে ভেতর দেখল। আগেরই অবস্থা। মিথ্যে দেখাদেখি তার।

বসতে ভালো লাগছে না, পায়চারি করতে ভাল লাগছে না। ভালো

লাগছে না ইরাবতী-জহানকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে তোলপাড় করতে। তোলপাড় করছে কি জয়মালা নিজে? মর্মান্তিক ব্যাপারকে টেনে আনার সখ কি কারো?

ইরাবতী, জহান—ওই নাম দুটো বড্ড বেশী জ্বালাচ্ছে তাকে। এতক্ষণ ভয় ধরছিল—ইরাবতীর জীবনটা কি সুধার হতে চলেছে? এখন আবার নতুন ধারায় চিন্তার খাত বইতে শুরু করেছে। জহানের মতো হবে না তো শেষে সুধার?

জয়মালা মনে মনে বলছে, মনকে শক্ত করার জন্য—ইরাবতী জহানের ব্যথা বেদনার চিত্র মুছে ফেলার জন্য—সুধার অমঙ্গল ভীতি দূর করে ফেলার জন্য। বলছে, সুধা জহান নয়। জহানের যা হয়েছে, সুধার যে তাই হবে—এ ভাবার কোন মানে হয় না। সুধার বিয়ে হবে প্রকাশের সঙ্গে। প্রকাশের মন মমতায় গড়া।

নির্জনে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে জয়মালা।—তুমি তো জানো প্রকাশ ও কি ধরণের মেয়ে এখনো সময় আছে। নিজেকে জিজ্ঞেস কর। নিজের বিবেকের সঙ্গে পরামর্শ কর। তারপর মত দিও। একটা আবেগের বশে উচ্ছ্বাসের মাথায় কিছু করে ফেলেছি বলে, পরে পস্তাবে—সেরকম যেন না হয়। মেয়েটার দুর্ভোগের সীমা থাকবেনা তাহলে। ও আমার বড় প্রিয়। ভগবান গলা দিয়েছে। ওই ভাঙিয়ে খাচ্ছে, খাক না। গান গেয়ে গান শিখিয়ে—যা হয় কিছু হচ্ছে তো। এখন বিয়ের বয়েস তোমাদের যায় নি। ওর আঠারো তোমার বাইশ। আরো ভাবো।

—ভেবেই ঠিক করেছি। পৃথিবী যদি একদিকে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আমার মত থেকে আমি এক পা নড়বো না। দৃঢ় গলায় বলেছে প্রকাশ।

প্রকাশের মতো শ্যামলাল বলেনি জহানকে? বলেছিল। বললে কি হবে? জহান তখন নিজেই শ্যামলালের কাছ থেকে সরে আসার জন্য, তার দিক থেকে শ্যামলালে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য নানান অজুহাত

খুঁজছে। সে যে বিষকন্যা। শ্যামলালকে ভালোবাসে। চায়, শ্যামলাল বেঁচে থাকুক। তার সংস্পর্শে ওর যে অনিবার্য মৃত্যু।

সুধার তো সে সবের বালাই নেই। বিষকন্যা হিসাবে জহানের মতো প্রকাশের কাছ থেকে সরে থাকার চেষ্টা করতে হবে না ওকে। বিয়ে ভাঙবে না। ভাঙতে পারে না। অন্য কোন কারণ নেই। জয়-মালার মন খুশীতে ভরে উঠেছিল।

সে খুশির মণিমুক্তো খসে খসে পড়ছে আজ মনের মুকুট থেকে। শুভ পরিণয়ের আয়নায় কালো ছায়া ঢেকে যাচ্ছে আচমকা। জয়মালার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। জহানের কথা কেউ কোন দিন কি বুঝতে চেয়েছে? বুঝতে পেরেছে?

না, না, জয়মালা নিজেই চিৎকার করে বলে উঠল।

বসতে ইচ্ছে নেই, কাঁহাতক বসে আর ওঠে। দাঁড়িয়েই বা থাকা যায় কতক্ষণ? চারপাইয়েই এসে বসল আবার। যেখানে বসেছিল, সেখানে। শ্যামলালের মুখখানা ভেসে উঠছে। দুচোখে জল।

মুখটা ঘুরিয়ে নিল জহান। বলল, যে পুরুষ মেয়েদের মত কথায় কথায় কাঁদে, সে ছিঁচ্‌ কাঁদুনে পুরুষ আমার দু'চক্ষের বিষ—বিষ। আমি মুখ দেখতে চাই না তার। সে আমার স্বামী হাওয়ার অনুপযুক্ত। দ্যাখো শ্যামলাল, আমায় আশা কর তুমি কোন আশায়? ভালো কথা বলছি, আমার নামগন্ধ মুখে আনবেনা কোনদিন। কখ্‌খোনো না।

—তুমি তো নিজেই বলেছিলে—

বাকি কথাটা শেষ করতে দিলনা আর জহান। ধমকে উঠল। কি, বলেছিলাম কি? বিয়ে করব তোমায়? বেসরম কোথাকার। তোমার মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করবো আমি? মন দেখছিলাম স্রেফ। বুঝলে?

এততেও নড়ছেনা যে! কি করা যায়? জহান আর বেশীক্ষণ নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শ্যামলালের বুকে শেল বেঁধানোর জন্য যা বলল, সে সব যে জহানের

বুকে এসে বিঁধছে। নিদারুণ যন্ত্রণা। কি করে বাঁচানো যায় শ্যামলালকে তার বিষাক্ত নিশ্বাস থেকে। বুঝে উঠতে পারছে না। ওর চোখের সামনে থেকে না পালালে উপায় নেই।

নিজে বিষকন্যা জানার পর থেকে, ওকে এড়িয়ে চলেছে জহান। ও ছাড়তে চাইছে না মোটে। কথার যন্ত্রণা দিয়ে অবহেলা দেখিয়ে, ঘৃণা করেও পার পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কথা কানে নেয় না আর। দুর্ব্যবহারও দাগ কাটেনা ওর মনের কোণে।

শ্যামলালের চোখের পাতা ভেজে। ঠোঁট নড়ে ওঠে। মুখে কোন কথা সরতে চায় না। শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে। করুণ দৃষ্টি। জহানের ভেতরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। মোক্ষম আঘাত হানার জন্য বলে, সকলের মতো তোমার সঙ্গেও ভালোবাসার খেলা করেছি। আমি তোমার লয়লাও নই আর হীরও নই। মজনু সেজে রাংঝা সেজে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে? দেখার জন্য তীর্থের কাকের মতো বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে থেকেই বা আর লাভ কি? তোমার ধ্যানের এ লায়লার এ হীরের মৃত্যু তো আর হবে না যে, মরে অমর প্রেমিক হওয়ার সুযোগ পাবে। মরুভূমির মায়াকে সত্যি জল ভাবে নাকি কোন আহাম্মক?

লাঞ্ছনায়-গঞ্জনায় শ্যামলালকে একশেষ করে মায়ের পায়ে এসে আছড়ে পড়েছে জহান। অত চোখের জল কোথায় ছিল কে জানে। ভেসে গেছে মুখ ভেসে গেছে বুক। থামতে আর চায়না।

একটা কথাও বেরোয়নি ইরাবতীর মুখ থেকে। চোখ শুকনো খটখটে। মুখ গম্ভীর। ইরাবতী তো এইরকম দেখতেই চেয়েছিল মেয়েকে। বাসনা পূর্ণ হয়েছে। জহানের বুক ফাটছে, ইরাবতীর বুক মজবুত হয়ে উঠছে। ইরাবতীর ভেতরে আনন্দের ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছে।

জহান বলেছে, একটা কিছু ব্যবস্থা কর মা তুমি। আর পারছিনা। তোমার বিষকন্যাকে কিসে শেষ করা যায়—খুঁজে বার কর।

ইরাবতী বলেছে, বার করেছি। কাল সকালে নিয়ে যাবো

তোমায়। আমি তোমায় বিষকন্যা তৈরী করেছি। আমিই তোমাকে মুক্তি দোব। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

—কোথায় কেমন করে মুক্তি হবে আমার? জমাট ব্যাথা গলে পড়েছে জহানের স্বরে।

—সে সব জেনে দরকার নেই তোমার। আমার কর্তব্যের খাতিরেই ব্যবস্থা করবো আমি। দেখতেই পাবে ভোরে।

ভোর।

সাদাটে আকাশ। সূর্য উদয় হয়নি। ভিজে মাটি। বাতাসে সোঁদামাটির গন্ধ। বটতলায় পাখির কিচিরমিচির। লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোক্কর মারছে বটফলে।

মা-মেয়ে চলছে তাড়াতাড়ি। সকলের অলক্ষ্যে। সকল বলতে শ্যামলালকেই বেশি ভয়। পেছু নিলেই হল।

হনহনিয়ে চলছে ইরাবতী। মায়ের গতিবেগে সমান তাল রেখে মেয়েও চলছে পাশাপাশি।

যে-রাতে কিরণের ওখান থেকে চার বছরের জহানকে বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ইরাবতী—যে গান শুনেছিল সেই রাতে, সেই গান শুনছে আবার এই ভোরে। জহান ঘুমিয়ে পড়েছিল, শোনেনি। শুনছে। জহানের কাছে নতুন।

ভবানীর ঘরের দোরগোড়ায় এসে বসল মা-মেয়ে।

ত্রিলোকস্বামী চোখ বুজে বসে আছেন বাঘছালের ওপর। সামনে শ্বেতপাথরের বেদির ওপর শ্বেতপাথরেরই অষ্টভুজা সিংহবাহিনী। দুধারে কাঠের পিলসুজে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। ধুনুচির ধোঁয়ায় চন্দন গুগগুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়।

ত্বম অস্মাকম্ তবস্মসি।

আমি তোমার তুমি আমার—গাইছেন ত্রিলোকস্বামী।

ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস করে জহান। এ জায়গাটা অন্যরকম লাগছে। অশান্ত মন নিয়ে এসেছে, একটা শান্তির আমেজ আসছে। দিনরাতের শোনা গান নয় এ। অপূর্ব আস্বাদ এর। আনন্দ পাচ্ছে খুব। কেমন আনন্দ জানে না। আগে পায়নি কখনো। দরজার বাইরে মা-মেয়ে এসে বসল নিঃশব্দে।

প্রদীপের আলো, ধুনুচির ধোঁয়া পাথরের মূর্তিকে জীবন্ত করে তুলেছে যেন। মূর্তির হাসি হাসি মুখ কাছে টানছে। সদা আনন্দময় পুরুষ ত্রিলোকস্বামীর হাসি মুখের প্রলেপ পড়েছে হয়তো ভবানীর মুখে। অবাক হয়ে দেখছে জহান ত্রিলোকস্বামীকে আর মূর্তিকে। তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

গান থামল।

ত্রিলোকস্বামী ডাকলেন দু'জনকে ভেতরে।

ইরাবতীর চোখের কোণ চিকচিক করছে। পায়ে হাত ঠেকিয়ে মাথায় ঠেকাল। চোখের ইশারায় মেয়েকেও অনুসরণ করতে বলল। কখনো কারো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাকরি পছন্দ করে না জহান! এখানে কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো মায়ের অনুসরণ করল মেয়ে।

বসতে বললেন ত্রিলোকস্বামী।

ত্রিলোকস্বামীর সামনাসামনি বসে আছে ওরা।

জহানের আপাদমস্তক দেখলেন ত্রিলোকস্বামী বারদুয়েক। হাসলেন। বললেন, মা আমার সাক্ষাৎ ষোড়শী।

বয়েসও ওর ষোল বাবা। আপনার চরণে এনে ফেলে দিয়েছি। যা হয় একটা গতি করতেই হবে।

—মায়ের গতি মা নিজেই করে নেবে। আমি কি করার মালিক রে?

—আমরা তো আপনাকেই জানি।

—তুই কি চাস—বল না?

—ওর জীবনটা পরিবর্তন করে দিন।

এরপর ইরাবতী জানিয়েছে, কোন কিছুতেই শান্তি দেখলাম না তো কোথাও। ওকে অন্য পথ দেখিয়ে দিন!

—সন্ন্যাসের?

ইরাবতীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

ইরাবতীর আশা পূর্ণ হয়েছে।

জহানকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন ত্রিলোকস্বামী।

নতুন ধ্যানধারণা নতুন জগৎ—সমস্তই নতুন ঠেকল জহানের কাছে। জহান যেন নতুন হয়ে জন্মাল আবার। জন্মালেও পাথরের মূর্তিকে ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারেনি, আর ভুলতে পারেনি শ্যামলালকে। ত্রিলোকস্বামীর কাছে গোপন করেনি একথা।

বলেছে, পাথরের কি সহানুভূতি আছে? লোকের দুঃখবেদনা বুঝতে পারে কি? অসম্ভব!

ত্রিলোকস্বামীর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে। চোখে চোখ রাখা যায় না। বাইরে দেখার সঙ্গে জহানের ভেতরটাও তন্নতন্ন করে দেখছেন যেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন অপলক চোখে। তারপর বললেন, প্রবৃত্তির জ্বালা থেকে মনকে সরিয়ে রাখতে গেলে, পাথরের চিন্তায় পাথর করে ফেলাই ভালো। পাথর হলে—সবেতে নির্লিপ্ত নির্বিকার হয়ে থাকলে···শোকে দুঃখে মানুষ কাতর হয় না।

একটু থেমে আবার বললেন, তুমি কল্পনা বিশ্বাস কর না, না?

জহান মাথা নিচু করল! সম্মতি জানাল।

ত্রিলোকস্বামী বললেন, কল্পনা যে কত শক্তি ধরে, সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণাই নেই। কল্পনাকে মানুষ মিথ্যে ভাবে। কিন্তু তা নয়। কল্পনার এত শক্তি মিলন যুদ্ধ—সমস্ত কিছু ঘটায়। সুফীগুরু জালালউদ্দীনের পার্শী কবিতাটি বললেন—নিস্ত ওয়াশ বাশদ খিয়াল অন্দর জহান তু জহানরা বরখিয়াল বিন রওয়ান।

জহান কল্পনার শক্তি যে টের পায় নি, তা নয়। মন উথালপাতাল

করেছে যখন—ঘরে তিষ্ঠোতে পারেনি যখন, তখন ত্রিলোকস্বামীর কথা-মতো কল্পনার ডানায় ভর করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে নিজের দেহটাকে। যন্ত্রণা ভুলেছে জ্বালা ভুলেছে—অন্তত সেই সময়ের জন্য শ্যামলালকে ভুলেছে, আর ভুলেছে নিজেকে—নিজের অস্তিত্বকেও। বড় আনন্দ বড় শান্তি। সব জানার সব বোঝার অনুভূতি আত্মগোপন করে থাকে ক্ষণেকের জন্য।

অদ্ভুত ধরনের ধ্যান।

যেখানে বসে আছে জহান, সেটা একটা দ্বীপ। দ্বীপে সে একা। চতুর্দিকে জল আর জল। উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ে পড়ে ডুবিয়ে দিল সেই দ্বীপ। জলে ভাসছে আর ডুবছে জহানের দেহ।

জলের ওপর আকাশছোঁয়া আগুন জ্বলে উঠল। চারিদিকে আগুন। জহানের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভীষণ হাওয়ার বেগ। দুরন্ত বাতাসে দেহভস্ম উড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে আকাশময়।

আবার নামছে নিচে। আগুন নিভেছে। শান্ত হয়েছে সমুদ্র। দ্বীপটা জেগে উঠেছে জলের ওপর। জহানের দেহভস্ম ঝরে পড়ল দ্বীপের মাটিতে। জহান আগের শরীরে ফিরে এলো। আবার জলের আছাড়ি পিছাড়ি, আবার আগুন আবার বাতাস আবার দেহভস্ম। বৃত্তাকারে আসা যাওয়া চলছে জহানের। এক মনে এ ধ্যান করলে—হোক না কল্পনা—প্রবৃত্তির তাড়নাটা কি চাপা থাকে না ক্ষণিকের জন্য? ভুক্তভোগী জহানের তো চাপা থেকেছে।

এটুকুও ভেঙে তছনছ হয়ে যেতে বসেছিল। বান্ধবী মরিয়মের উৎপাতে। মরিয়ম আসবে জহানের কাছে দিনে অন্তত একবার। আসুক দুঃখু ছিল না, যদি না শ্যামলালের কথা কানে তুলত। যে তুষের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি, নিভবে না কোনদিন। সে আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে মরিয়ম জোরাল করে তুলত। বারণ করেছে জহান—এখানে আসিস না, ওর কথা শোনাসনি আমাকে। মৃত্যু পর্যন্ত একটু একা থাকতে দে। সবাইকে ভুলে যেতে দে।

মরিয়ম ক্ষেপে উঠেছে। লজ্জা করে না বলতে? সন্ন্যাসী সেজে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে দোব না আমি তোকে। আমি যতদিন বাঁচবো—ততদিন তোর নিস্তার নেই। জ্বালিয়ে পুড়ে খাক করে ছাড়বো তোকে। ছোঁড়াটাকে পাগল করে দিয়ে পুণ্যি করা হচ্ছে।

একটু দম নিয়ে আবার বলেছে মরিয়ম। এত অন্যায় মানুষেরও সয়? তোর সইছে কি করে রে? বেচারার নাওয়া গেছে খাওয়া গেছে। কারো কথা কানে যায় না, মুখ খুলে কথা কয় না। বড় বড় চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কেবল। হোরিখেলার মাঠে প্রায় সবসময়ই ঘুরে বেড়ায় আনমনে। বাড়ির ত্রিসীমানায় পাত্তা পাওয়া যায় না। অনেকে দেখেছে, ভাঙা ইঁদারার অন্য পাড়টায় গিয়ে বসে কখনো কখনো। মাঠে কেউ থাকলে, মানা করে। শোনে না।

একনাগাড়ে সমস্ত শুনিয়ে চুপ করে বসে থাকে মরিয়ম। যাকে শোনানো হল, তার মুখের কথা শোনার জন্য।

কথা কইবে কে? নিজেকে ভোলার জন্য শ্যামলালকে ভুলে থাকার জন্য মনে মনে ধ্যান করে চলেছে জহান। বসে থেকে থেকে মরিয়ম বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বলছে, সর্বনাশী। কানের মাথা খেয়ে বসে আছিস নাকি? এমন করে নিরীহ ছেলেটাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবি জানলে, নিজে হাতে বিষ তুলে দিতাম তোর মুখে। তোর মতো পাষাণীর মরে যাওয়াই উচিত ছিল।

ধ্যান ভেঙেছে জহানের। মরিয়ম জানে না—বিষেও জাহানের কিছু হবে না। জহান বিষকন্যা। বিষে মরত না। মরবে না। বিষণ্ণের হাসি ঠোঁটে।

সর্ব শরীর জ্বলে উঠেছে মরিয়মের। পোড়ার মুখে হাসতে লজ্জা করে না? তুই ম'লে শেয়াল কুকুরও কাঁদবে না দেখিস। দুম দুম করে বেরিয়ে গেছে মরিয়ম ঘর থেকে।

জহান হাত চাপা দিয়েছে দু'চোখে। কান্না বন্ধ করার কি কোন ধ্যান নেই? সব ধ্যানই ধুয়ে ভেসে যায় চোখের জলে। জহানের

সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে রইল কি অবুঝ কান্না।

যেভাবে রেগেমেগে চলে গেছে মরিয়ম, জহান ভেবেছে, এ মুখো হবে না আর। হয়নিও বছরখানেক। এলো হোলির দিন। ওকে দেখে বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল জহানের।

এবারে আর উগ্রভাব নেই চোখেমুখে। বলল, জহান সব শেষ। তোর এখানে আমার এই আসাও শেষ। আর জালাবো না। যাকে বাঁচানোর জন্য আসতাম, সে আর নেই। চলে গেল। মরিয়ম হাপুসনয়নে কাঁদছে।

দাঁড়াতে পারল না জহান। বসে পড়ল মেঝেয়। মাথাটা ঘুরছে। দেয়াল সেও বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বুকের মধ্যে আনচান করছে বড্ড। প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবে এখুনি। অন্ধকার। চতুর্দিক অন্ধকার। জহান কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে।

জ্ঞান হতে চোখ খুলে দেখেছে জহান, ত্রিলোকস্বামী মাথার কাছে বসে। মরিয়ম কখন চলে গেছে কে জানে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জহান।

ত্রিলোকস্বামী সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, দেহ যায়, মানুষ যায় না। বেঁচে থাকে অন্যের মনে তার প্রকৃতি, তার চেহারা, তার গুণ।

শ্যামলালের ভস্ম আকাশে জলে-মাটিতে মিশে আছে। তার শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশে রয়েছে। সেই নিশ্বাস তোমার নিশ্বাসে যাচ্ছে তোমারই ভেতরে। কোথায় হারিয়েছে সে? হারায়নি তো।

মরিয়ম বলে গেছে ত্রিলোকস্বামীকে। নির্বাক শ্যামলাল মৃত্যুর আগে দেখেছে কল্পনায় জহানকে। জহান যেন বসে আছে ইঁদারার ওদিকের পাড়ে। গতবছরে যে পাড়টা ধসে পড়েছিল, তার উল্টোদিকে। হোলির উৎসবে তখন মাঠের বেশীর ভাগ লোকই লাঠি-তলোয়ার খেলায় মাতোয়ারা।

'জহান' বলে চিৎকার করে উঠল শ্যামলাল। দৌড়ল। পাড়ে বসা মাত্র, পাড় ধসে জীবন্ত সমাধি। পাড়টা এমনই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, একটু একটু করে খসছিল রোজ। দু-তিন দিন ধরে কাছে যেত না কেউ। চক্ষের নিমেষে ঘটনাটা ঘটে গেল। কাছে যারা ছিল, গিয়েও সময়মত আটকাতে পারেনি ওকে। সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল ও।

ভাগ্যকে বলিহারি।

মাঝে মাঝে একলা ঘরে বসে ধিক্কার দেয় জহান। শ্যামলাল গেছে। বছর ঘুরতেই ত্রিলোকস্বামীকে হারালো। ত্রিলোকস্বামীকে হারিয়ে সত্যি সত্যি একা বোধ হত নিজেকে। একটা হাহাকার একটা শূন্যতা পাগল করে তুলত।

পৃথিবীতে এসেছিল কেন?

দুর্ভোগ পোহানোর জন্যই কি?

মহতের আশ্রয়ে থেকেও তো মনের যাতনা থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। কেন এমন হল তার জীবন? কি এমন অন্যায় করেছে জগতের কাছে? দোষ জানল না, সাজা পেয়েই চলবে কেবল? কিসে মুক্তি পাবে—কে দেবে—কেমন করে?

বছর তিনেক ধরে এসমস্ত প্রশ্ন তার মনের ওপর নির্যাতন করছে ভীষণ। সুখ-সোয়াস্তি এতটুকু পায়নি বললেই চলে। প্রশ্নের আওতা থেকে মনকে বার করে আনার প্রয়াস কম হয়নি। ব্যর্থ হয়েছে জহান। প্রবল প্রতাপ ওই দিকেই। নিজেকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

খবর এলো, মা ডেকে পাঠিয়েছে—মৃত্যুশয্যায়। এখুনি যেতে হবে। যেমন অবস্থায় আছে, তেমন অবস্থায় যেতে হবে এক তিল

দেরী না করে। গিয়ে হয়ত দেখা নাও হতে পারে।

পড়িমরি করে গেল জহান।

হাতের ইশারায় কাছে ডাকল মা। হতভম্ব জহান। সেই মা সেই চেহারা—চেনা যায় না। চোখদুটি সার। অত ফর্সা—কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সর্বাঙ্গে। ধবধবে সাদা চাদর ঢাকা একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে মেঝের ঢালা বিছনায়।

পায়ে পায়ে কাছে এলো। বসল বিছানায়। ইরাবতীর দু'চোখে জলের ধারা, ক্ষীণকণ্ঠ। ঘর থেকে সরে যেতে বলল সকলকে। খুব আস্তে আস্তে যা বলল, জহানের না শুনলেই ভালো ছিল। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। অসম্ভব যন্ত্রণা। কান্না আসছে। কিন্তু কাঁদতে পারছে না। হাঁপাচ্ছে। বড় দেরী হয়ে গেছে। শ্যামলাল কোন লোকের কতদূরে কে জানে।

চোখের কোণ গরম গরম ঠেকছে। রক্ত না জল? যা হয়—দু' ফোঁটা পড়ুক অন্তত ঝরে। পড়ল না। মা যা বলছে, শুনতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে দু'হাতে চেপে ধরে দু'কান। পারছে না। হাত দুটোও শত্রুতা করছে। অবশ। কোলের কাছে যে পড়ে আছে-- উঠতে চাইছে না মোটে।

ইরাবতী বলছে, তুমি বিষকন্যা নও! মিথ্যে ছলনা করেছি তোমাকে বাঁচানোর জন্য। আমার জীবন নতুন করে পাও—চাইনি আমি। এখানে যখন এসেছিলাম, বিষ যোগাড় করেছিলাম। তেমন পরিবেশ পরিস্থিতি কোনদিন এলে—অমৃতের কাজ করবে মা-মেয়ের!

মাথার বালিশের নিচে থেকে চাবি বার করে নিয়ে, বেতের ব্যাগ খুলে বিষের শিশিটা বার করে নিতে বলেছে ইরাবতী। চারপাইয়ের নিচে ব্যাগটা রয়েছে। বলেছে, তোমাকেই দিয়ে গেলাম। কিরণের মতো অনেকে ঘুরছে চতুর্দিকে। প্রশ্রয় দেবে না। তেমন কেউ এলে সে পাপকে সরিয়ে দেবে দুনিয়া থেকে। একটা কিরণ বেঁচে থাকলে শত-সহস্র মেয়ে বিপদে পড়বে। একাজের জন্য মরতে হয়—

মরবে। মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিতে হয়, নেবে। আমি যা করতে পারিনি, তুমি তাই করবে। না হলে, মরেও সুখ নেই আমার।

ইরাবতী গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে জহানকে।

কথার মাঝে জহান বলেছিল মাকে—প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না আমি—শ্যামলাল তো কিরণ ছিল না। মিথ্যে আশঙ্কায় অমূল্য প্রাণটাকে বাঁচতে দেয়া হল না।

ইরাবতী বলেছে, কিরণ আমার চোখের সামনে বেঁচে আছে এমনভাবে - এত ঘা খেয়েছি আমি, বিচারে ভুল হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। তোমার বিচারে সে ভুল হবে না এখন। ত্রিলোকস্বামী বেঁচে থাকতেই বলেছিলেন আমায়।—ওকে অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি রে ইরা—তুই যা ভাবছিস সে পথে পা বাড়াবে না ও। ও তোর জহান্নম নয়। আমি বিশ্বাস করি তাঁর কথা। তবুও তিনি নেই, আমি থাকবো না। একটা অস্ত্র হাতে রাখা দরকার। তুমি একেবারে একা।

জহান দেখছে। ত্রিলোকস্বামীর মুখখানা ভেসে উঠেছে। দেখছেন। চাউনিটা এমন, যেন কথা কইছে। বলছে—ও যা বলছে, শুনতে দোষ কি? অনেক জ্বালা সয়েছে ইরা। ভয়টা কি আর ওর এমনি এমনি। জীবন নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলেনি কিরণ, খেলেনি কিরণের বন্ধু—অন্য লোকেরা? শেষ সময় যদি তোমার প্রতিশ্রুতিতে একবিন্দুও শান্তি পায়···ক্ষতি কি তোমার?

সম্মোহিতের মতো মায়ের শীর্ণহাতে হাত রেখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইরাবতীর কালিপড়া ঠোঁটে এক টুকরো হাসির ঝিলিক উঁকি মেরে মিলিয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ ঘর।

মা-মেয়ে একেবারে চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। ইরাবতী মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখল কিছুক্ষণ। তারপর প্রতিশ্রুতিটা মেয়ের মনে গেঁথে বসানোর জন্য বলল, বিপদের কথা জানলে, উদ্ধার করার নেই কেউ। শোনারও না। কিরণের খপ্পরে

পড়ে, একলা ঘরে অনেক দেবতার উদ্দেশে মাথা ঠুকেছি দেয়ালে। কিছু হয়নি। কপাল দিয়ে রক্ত ঝরা সার হয়েছে। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে আরো। বিপদে পড়লে, নিজেকেই রক্ষে করতে হবে নিজে। তুমি সত্যিসত্যিই বিষকন্যা হয়ে উঠবে।

মায়ের এ কথা শুনে শিউরে উঠেছে জহান। সত্যিসত্যিই তো বিষকন্যা সে মনেপ্রাণে। তা নাহলে শ্যামলাল গেল কেন? শ্যামলালের মৃত্যুর জন্য দায়ী সেই। দোলের দিনে শ্যামলালকে মনে পড়েছে তার বেশী করে। ভাঙ্গা ইঁদারার এদিকের পাড়টা ধসে গেছল। মনে হয়েছে সে ওদিকের পাড়ে বসে আছে। তাকে দেখে ছুটতে ছুটতে আসছে শ্যামলাল। ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠেছে চিন্তা করতে।

এই চিন্তায় এমনই ডুবে গেছল, অন্য কোনদিকে হুঁশ ছিল না। জহানের চিন্তায়ও এমন বিষ—প্রভাব বিস্তার করেছে শ্যামলালের মনে দূর থেকেও। জহানের মনের দেখা শ্যামলালের মন দেখতে পেয়ে দৌড়ে গেছে…।

জহান ইরাবতীর বিষকন্যা।

ত্রিলোকস্বামী নেই শ্যামলাল নেই ইরাবতী নেই।

সদাসর্বদা নিজেকে মগ্ন করে রাখে জহান কাজের মধ্যে। ত্রিলোকস্বামী যে কাজ মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাস দেয়ার সময় বলেছিলেন, যারা অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, যেতে পারে—যথাসাধ্য তাদের আলোর পথ দেখাবে। এই হবে তোমার সাধনা। সমাজ যাকে ঘেন্নার চোখে দেখবে, তুমি তাকে মমতা ঢেলে দেবে। আশ্রয় দেবে। প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দেবে। তাদের সুখশান্তির মধ্যে তুমি নিজের সুখশান্তি খুঁজে পাবে। এ সুখের এ শান্তির ক্ষয়বয় নেই। অঢেল-অফুরন্ত।

ত্রিলোকস্বামীর আদেশ জহান শিরোধার্য করেছে। অক্ষরে

অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে।

উপদেশ দেয়ার সময় কাজের ভার বোঝানোর সময়—বিশেষ করে বলেছেন তিনি, দুঃস্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেলবে একেবারে। পুষে রাখবে না, বাড়তে দেবেনা। সন্ন্যাসের সময় যে নাম দিয়েছি তোমায়—সে নাম জপ করবে নিশ্বাসে নিশ্বাসে। তুমি জয়মালা—জয়ের মালা। সতর্ক হয়ে থাকবে। পরাজয়ের মালা যেন না পড়ো। তুমি ইরাবতীর জহান্নম নও, তুমি ত্রিলোকস্বামীর জয়মালা জয়মালা···।

মায়ের মৃত্যুর বছর খানেক বাদে সুধা এলো। সুধার মধ্যে নিজেকে দেখল যেন জয়মালা। নিজে যা হারিয়েছে, সুধার মধ্যে দিয়ে পুরণ করে নিতে চেয়েছে। অন্ধকারের ভিতে যে মেয়ের দেহের গড়ন, আলোয় নাইয়ে নাইয়ে সুন্দর সুশ্রী করে তুলতে চেয়েছ। পণ্ডশ্রম হয়নি।

সুরপাগল সুধা জয়মালার মানসকন্যা। বয়সে অনেক বেশী তফাৎ না হলেও, মনের দিক দিয়ে সুধার মা হয়ে বসেছে জয়মালা। চোখের বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে, দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। প্রধান উদ্যোক্তা সেই। বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত—সদা ভয়। অমঙ্গল না ঘটে কোন।

নিজেকে বোঝায়—এ ভাবনা মিথ্যে। নিজের ঘটেছিল বলে কি সকলের ঘটবে? এটা স্রেফ অতীতের ছায়া। অগোচরে এসে পড়ে চিন্তার দরজা ঠেলে বারে বারে।

মনকে প্রবোধ দিলে কি হবে? চোখের সামনে দিনকে দিন এক-জনের প্রকৃতি যা দেখছে, তাতে না ভেবেও পারা যায় না। চোখ কান বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়েও থাকা যায় না। নেহাত সরল বলেই তো সুধাকে নিয়ে যত জ্বালা জয়মালার। চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করে। মৃগেনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

সোনার কারবারী মৃগেন। সোনাদানার লোভ দেখিয়ে, মেয়েদের কব্জায় পুরে রাখতে চায়। জয়মালা জানে। তবু ভবানীর আরতির সময় যদি এসে বসে চোখ বোজে, তাকে বিদায় করাও যায়না সব জেনেশুনে।

মুখমিষ্টি মানুষ। ভবানী-মা বলতে দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মেয়েদের জন্য অনেক খরচই করতে চায়, করেও। জয়মালা মানা করে। হেসে বলে মৃগেন, মা দিচ্ছে, তাই দিতে পারছি। ক'জনের ভাগ্যেই বা এরকম হয়? ইচ্ছে থাকলেও তো পারেনা অনেকে। অপার করুণা মায়ের।

মৃগেনের চাউনির মধ্যে লালসার তরল আগুন টলটল করে ওঠে। চোখ এড়ায়না জয়মালার। সরে যায় কাছ থেকে।

নিরাভরণ জয়মালার অঙ্গ অনেক গয়নায় মুড়ে দিতে চেয়েছিল মৃগেন। বলেছে, আপনি মায়ের সেবিকা, এরকম বেশ আমার ভালো লাগে না। মা আমার রাজরাজেশ্বরী। তার মেয়ে এমন ভিখিরির মতো থাকবে কেন? বেনারসী শাড়ী গয়না পরতে মায়ের যখন দোষ নেই, মেয়ের থাকা উচিত নয়। মনে কষ্ট হয় আমার। গেরুয়া থান, রুক্ষু চুল। এ আবার কেমনতর সাধনা? দাসকে আদেশ করলে, অভাব থাকে না তো কিছুর।

কথায় কথা বাড়বে। সুযোগ চাইছে মৃগেন। যে কোন ছুতোয় আটকে রেখে কথা কওয়া। উত্তর না দিয়েই ঠাকুরঘরের ভেতর ঢুকে গেছে জয়মালা।

রেহাই পায়নি। দুরাত্মার প্রলোভন ভয়ঙ্কর। পরদিন শাড়ী-গয়না বালা-হার-মাকড়ি পানভর্তি রূপোর ডিবে—পায়ের কাছে ডালা সাজিয়ে রেখেছে মৃগেন। বলেছে, ফেরৎ দিলে ব্যথা পাবো। আপনার কাউকে ব্যথা দেয়া ধর্ম নয়।

লাথি মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে সমস্ত। নিজেকে সংযত করতে সময় লেগেছে। চলে গেছে ভেতরে। মূর্তির সামনে চুপ করে বসে থেকেছে খানিক। চটালে চলবে না, শত্রু বৃদ্ধি হবে। ওর মতো মনের মানুষ অনেক আছে। সুযোগ খুঁজছে তারাও। এক জোট হয়ে, ভবানী আশ্রমকে যমের দক্ষিণদোরে পাঠানোর জন্য উঠেপড়ে লাগবে। ত্রিলোকস্বামী বলেছেন, সৎকাজে অনেক বাধা অনেক

উপদ্রব। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরীক্ষা বলে মেনে নেবে। শত্রুর সঙ্গেও সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করবে। শত্রুকে চিনতে পারলেও, জানতে দেবে না। জানলে সর্বনাশ। নিজের গুণাগুণ প্রকাশের ভয়ে, আগেভাগে বদনাম রটিয়ে অনিষ্ঠ করে বসবে সর্বপ্রথম।

বাইরে এলো জয়মালা। সাজানো ডালা তুলে নিল দুহাতে। সুধার বিয়েতে দিয়ে দেবে।

খুশিতে ডগমগ হয়ে মৃগেন বলল, একদিন গরিবের বাড়িতে দয়া হোক না। পদধূলি দিন না। অধমের বংশের সদগতি হোক।

জয়মালা একগাল হেসে বলেছে, সময় হলে যাবো।

জয়মালার মাথাটা কিরকম করে উঠেছে! সে—কি? ইরাবতীর জহান্নম, না কিরণের জহান, না ত্রিলোকস্বামীর জয়মালা? আসল কোনটা সে—নিজেই বুঝতে পারছে না। সব কটা এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে তাকে ঘিরে ধরেছে

অন্য দিন এরকম ধরে না। ধরেছে ক্ষণ বুঝে আজ। সুধার বিয়ের দুদিন আগে। সুধা আসছে না এখনো।

নিজের ইরাবতীর জীবনের প্রেতাত্মা দেখছিল জয়মালা সুধার মধ্যে। দাঁড়িয়ে-বসে পায়চারি করতে করতে চারপাই থেকে উঠে পড়ল। আর ভাববার সময় নেই।

কদিন ধরে সুধাকে ওর বাড়ি যেতে বলছিল মৃগেন। গান শেখানোর জন্য কোথায় নাকি ছাত্রী আছে, ব্যবস্থা করে দেবে। জয়মালা বারণ করেছে। কিন্তু মৃগেনের মতো বড় শিকারীর ফাঁদে পা না দিয়ে বেরিয়ে আসার শক্তি সুধার মতো মেয়ের নেই। ও বড় দুর্বল। লোকের কথায় বড় বিশ্বাসী।

ছাত্রীকে গান শিখিয়ে ফেরার পথে কে জানে মৃগেনের খপ্পরে পড়েছে হয়তো। বোঝানোর ক্ষমতা আছে মৃগেনের। যে কোন

লোককে আকৃষ্ট করার জন্য কথার যাদু নখদর্পণে। বাড়িতে নিয়ে গেলেও যেতে পারে।

পারে কেন—গেছে গেছে গেছে। জয়মালার ভেতর থেকে কে যেন জোর করে বলে উঠল। কে যেন বলল, একদম দেরী নয়—সর্বনাশ এসে গেছে সুধার। মা-মা বলে ডাকছে তোমায়। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে! বেরিয়ে যাও!

পরনের গেরুয়া থান বদলে, মৃগেনের দেয়া নীল বেনারসী পরল। হাতে বালা কানে মাকড়ি গলায় হার। সোনালী-রূপালী তবক দেয়া পান কিনিয়ে এনে রূপোর ডিবেয় সাজাল। গোলাপ জলে ধোয়া পান খেতে ভালোবাসে মৃগেন। সেই পানই দিয়েছিল। হাত দেয়নি জয়মালা। শুকিয়ে যেতে ফেলে দিয়েছে।

আনা পান থেকে মুখে পুরে দিল জয়মালা একটা। চিবোচ্ছে। টকটকে লাল হয়ে উঠলো ঠোঁট। আয়নায় মুখ দেখল। নিজে নিজেই বলে উঠলো, অপরূপা। শোয়ার ঘরে ঢুকল একবার। বেরিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। বুকের ভেতর জামার তলায় পানের ডিবে রাখল সযত্নে।

কেউ যাতে না চিনতে পারে, ওড়নায় মুখ ঢেকে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল জয়মালা। হনহন করে চলেছে।

মৃগেনের বাড়িতে এলো।

এ বাড়িতে মৃগেনের বৌ-ছেলে থাকেনা কেউ। গাঁয়ের অনেকখানি ভেতরে বাপঠাকুরদার ভিটেয় বাস ওদের। মৃগেন যায় মাঝে মাঝে। ব্যবসার সুবিধের জন্য এ বাড়িতে থাকে মৃগেন।

পশ্চিমের ঘরে পরদা ঝুলছে। নীল রঙের। নীল রঙটাই মৃগেনের বেশী পছন্দ। পোশাক ছাড়াও, আংটি পরবে—তাতেও, নীল পাথর। ঘরের ভেতর থেকে মৃগেনের হাসির শব্দ ভেসে আসছে উঠোনে।

পরদার পাশ দিয়ে জয়মালা ঘরে ঢুকল। মৃগেন চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিতে বেশী সময় লাগেনি। কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

হাসতে হাসতেই বলল, কি সৌভাগ্য আমার! এ না হলে কি মানায়? বসুন, বসুন।

দেয়ালের সঙ্গে এঁটে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুধা। বিবর্ণ মুখ। কাঁপছে

সুধাকে দেখল জয়মাল, চোখ ফেরাল মৃগেনের দিকে।

মৃগেন কাচুমাচু মুখ করে বলল, এমনি—ওকে নিয়ে এসেছিলাম একটা ছাত্রী আসার কথা ছিল বলে।

সুধার দিকে চেয়ে বলল, তুমি যাও এখন। আমি খবর দোব'খন।

জয়মালা ইশারা করে দিল সুধাকে তাড়তাড়ি চলে যেতে। বলল. আমার যেতে একটু দেরী হবে।

চলে গেল সুধা।

দুদিন বাদে বিয়ে হবে সুধার প্রকাশের সঙ্গে।

আনমনা হয়ে পড়লেন কেন? মৃগেন জিজ্ঞাসা করল।

জয়মালা বলল, আসবো বলেছিলাম, এসেছি, কথা রেখেছি! ভাবছি, আজ তোমার অভিসারিকা আমি। আমাকে পেলে আর কাউকে চাইবে না তো আর?

না, না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। জয়মালার হাত ধরতে গেল মৃগেন। এগিয়ে এলো কাছে, জয়মালা সরে গেল একটু। মৃগেনের মুখ থেকে উগ্র গন্ধ বেরোচ্ছে।

মৃগেন দেখছে জয়মালাকে। দুনিয়া খুঁজে এ মেয়ের জুড়ি পাওয়া ভার। মৃগেন জানে ও কত রূপসী। গেরুয়া ফুটে চোখ ঝলসানো রূপ বেরিয়ে আসত। এ মেয়ে যে আসতে পারে—কল্পনার বাইরে স্বপ্নের বাইরে। সত্যি এসেছে, না নেশার ঘোরে দেখছে? চোখ বড় বড় করে তাকাল। সত্যি।

কাঠের বড় চৌকির ওপর নীল ফরাশ পাতা। বসে আছে দুজনে কাছাকাছি। বসে বসেই এগিয়ে আসছে মৃগেন। ফরাশ কুঁচকে যাচ্ছে। দুজনের ব্যবধান ছোট হয়ে আসছে। সরে যাচ্ছে। মৃগেনের রক্ত চক্ষু। জয়মালাকে গিলে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

জয়মালা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কি করবে? পালালে সুধার নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কে জানে কি কাণ্ড করে বসে মৃগেন। না পালালে, পরাজয় অনিবার্য। ত্রিলোকস্বামীর জয়মালার মৃত্যু।

মায়ের কণ্ঠস্বর শুনছে, সত্যি সত্যিই বিষকন্যা হয়ে উঠবে। বুকের ভেতর থেকে পানের ডিবে বার করে, ঢাকনা খুলে রাখল ফরাশের ওপর।

মৃগেন খুব খুশী। পান ভালবাসে বলে এনেছে জয়মালা। তর-সইল না। সোনালী তবকের দু' খিলি এক সঙ্গে মুখে পুরল। বিষ মেশানো পান খেয়ে ঢলে পড়ল ফরাশের ওপর। গোটা শরীর নীল হয়ে গেছে মৃগেনের।

জয়মালা দেখছে, শ্যামলাল দূরে দাঁড়িয়ে। দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছে তাকে। কাছে আসতে পারছে না। চেষ্টা করছে। তবুও না।

জয়মালা শ্যামলালকে দেখতে পাচ্ছে না আর। দেখছে রূপোর ডিবে। সোনালী তবকের খিলিটা জ্বল জ্বল করে উঠছে।

ত্রিলোকস্বামীর গান শুনতে পাচ্ছে।—ত্বম অস্মাকম অবস্মাসি। আমি তোমার তুমি আমার।

॥ দুই ॥

একটা অজানা আশংকা যে মনের মধ্যে বাসা না বাঁধছে, তা নয় ; বাঁধছে। কিন্তু এগোনোর জিদ একটু থিতিয়ে গেলেও, পরমুহূর্তে ভেসে উঠছে। আরো জোরালো হয়ে উঠছে। একটা প্রবল আকর্ষণ টানছে জয়ন্তকে।

বাড়িটার হদিস যখন পেয়েছে, তখন পৌঁছুতে হবেই হবে। যদিও দূরে, তবে এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে সপ সপে হয়ে এগোচ্ছে জয়ন্ত।

হাতের ঘড়িটা ছাড়া বেলা বোঝার উপায় নেই। আকাশে ঘনঘটা। কালোয় ঢাকা। কড়কড় শব্দে তালা লাগছে কানে। চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের চমক প্রতিপদক্ষেপে। বাড়িটার সঙ্গে যোগসাজস করে দুর্যোগ নেমেছে বোধ হয়। জয়ন্ত যাতে পৌঁছুতে না পারে।

একটা কথাই বেশী করে কানে বাজছে কেবল।—জয়ন্ত! নাই বা গেলি ওখানে। কি দরকার। আমার কথা শোন্। ও জায়গার ত্রিসীমানা মাড়াবি না। গোঁয়াতু´মি করবি নি কিন্তু একদম। ওখান -কার কথা ভুলে যা! মন থেকে মুছে ফেল! মুছে ফেল, মুছে ফেল।

জয়ন্ত পারছে না মুছে ফেলতে। মুছে ফেলতে গিয়ে আরো আঁকড়ে ধরছে। আরো মনে পড়ছে। জয়ন্তর ভেতর দু'টো মন কাজ করছে পাশাপাশি। একটা বলছে, বারণ শোন্। বিপদ আছে বলেই হয়তো বারণ করেছে। পথে আসার সময় তার নমুনাও তো পাওয়া গেল। এ সব তো হঠাৎ হঠাৎ ঘটে গেল। এগুলো কি শুভ-ইঙ্গিত? অশুভ-করাল ছায়া নয়?

লাহেড়ীয়ায় রোদ্দুর-ঝলমল নির্মেঘ আকাশ দেখে ট্রেনে উঠেছে। এখানে নেমে দেখল তার বিপরীত। মেঘলা আকাশ। স্টেশনে

দু'চারজন লোক ছাড়া বেশী মুখের ভীড় নেই। অল্প সময়ের মধ্যে স্টেশন ফাঁকা হয়ে গেল।

একে-ওকে জিজ্ঞেস করে গন্তব্যস্থলের নিশানা পেয়েছে জয়ন্ত। কিন্তু অতদূর যাওয়ার কোন গাড়ি চোখে পড়ল না। না গরুর গাড়ি না সাইকেল রিক্সা। অনেকক্ষণ একা বসে থাকার পর একটা রিক্সা পাওয়া গেল। চালক রূপে যমদূত। মেজাজে উগ্রচণ্ডা। নিয়ে আসতে চায় না কিছুতেই। অন্য পথে যেতে বললে যাবে, এপথে আসবে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে, মুখ খুলল না! নির্বাক হয়ে রইল। ভয়ের ছায়া ছেয়ে গেল মুখময়।

অনেক করে চতুর্গুণ ভাড়াব প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ অবধি রাজি করানো গেল। সর্ত—ও বাড়িতে পৌঁছে দেবে না। মাঝ রাস্তায় নেমে, হেঁটে যেতে হবে। জয়ন্ত রাজী হয়েছে। তবুও খানিকটা পথও তো আরামে যেতে পারবে।

রিক্সায় ডান পাটা রেখেছে সবে, ঘড়ির টিকটিক আওয়াজটা জোর শোনাল যেন। আর সেই সঙ্গে সেই কথা শুনল আবার।—নাই বা গেলি ওখানে······গোঁয়ার্তুমি করবি নি একদম······।

একটু থমকে গিয়ে রিক্সায় উঠে বসেছে। মাঝপথেও আসতে হ'ল না। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে আনুসঙ্গিক যা কিছু—সমস্ত একসঙ্গে এসে গেল। বাতাসের দাপট বিদ্যুতের ঝলক আকাশ ফাটানো হাহাকার শব্দ। দাঁড়ানোর স্থল নেই কোথাও যে জয়ন্ত একটু নেমে দাঁড়াবে কোন বড় গাছের তলায়। এধারে বড়গাছ নেই বললেই চলে। কেবল ছোটগাছের ঝোপঝাড়।

রিক্সা এগোল বিশ-পঁচিশ হাত। ব্যস, ওই পর্যন্ত। চাকা ডুবল নরম কাদামাটিতে। তুলতে প্রাণান্ত চালকের। নামিয়ে দিল। স্পষ্ট কথা—আর কিছুতেই নিয়ে যাবে না। পয়সা পাক, না পাক।

হাঁটা পথে পা বাড়াতে গিয়ে, সেই কথার প্রতিধ্বনি শুনেছে জয়ন্ত

আবার। বাইরে থেকে নয়, নিজের ভেতর থেকে। সেই একই সাবধান-বাণী। অগ্রাহ্য করা স্বভাব, অগ্রাহ্য করল। চলেছে।

এদিকে বড় বড় গাছে ভর্তি। কেয়াবন দু'পাশে। টর্চের আলো ফেলে ফেলে এতখানি এলো। গাছ যে এত হিংস্র হতে পারে এই প্রথম দেখছে। আশপাশের বাড়িগুলোকে জাপটে ধরে ফাটিয়ে চৌচির করে ফেলেছে। কি আক্রোশ।

অনেক কিছু অসহ্য ব্যাপারের নীরব সাক্ষী বলে কি এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে?

জয়ন্তর মাথার মধ্যে এ প্রশ্ন কেমন করে আচমকা উদয় হল, ভেবে কূলকিনারা পেল না।

কখনো বুটজুতোসুদ্ধ কাদায় ডুবছে, কখনো কাঁটাগাছের কাঁটা বিঁধে প্যাণ্টে টান ধরছে পেছন থেকে। কে যেন টেনে ধরছে, এগোতে দেবে না তাকে। কেয়াবন থেকে হিসহিস শব্দ উঠছে। বিষাক্ত সাপের হুঁসিয়ারি হয়তো।

বিদ্যুতের আলোয় দেখছে জয়ন্ত।

বাড়িটার ছাদের পাঁচিল। দোতলার বন্ধ জানলা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই দুর্যোগে এই জঙ্গলের মধ্যে ওটা যেন একটা রহস্যপুরী।

সাধ্যমতো দ্রুত পা চালাচ্ছে।

বিকেলে রাতের অন্ধকার নেমেছে কিছুক্ষণ।

চলতে চলতে জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িটার কাছাকাছি এসে গেছে। যেমন বর্ণনা শুনেছিল, ঠিক তেমনিই। এই বাড়িটাই। সত্যিই এককালের প্রাসাদ। জানলায় দরজায় কার্নিসে, আলসেতে বট আর অশথ পালা করে দখল নিয়েছে যেন।

জয়ন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্দিকে দেখছে। প্রবেশপথ কোন-দিকে। বাড়িটাকে ঘিরে গোল করে খাল কাটা। খালের কিনারে কিনারে জল টলমল করছে। জলের ওপর বাড়িটা একটা দ্বীপ।

জয়ন্তর মনে হচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই কালো জলে। সাঁতরে বাড়ির দোরে গিয়ে ওঠে। বৃষ্টি কমে আসছিল, বেড়ে উঠল আবার। এবার সেই কথার প্রতিধ্বনি ডুকরে কেঁদে উঠল যেন জয়ন্তর ভেতরে। বুকটা তুমড়ে মুচড়ে দিয়ে।···গোঁয়াতু´মি করিস নি একদম।

জয়ন্তর আর একটা মন বলল, এতখানি এলিই যখন, চলে যা ভেতরে! দেখে আয় মহলের পর মহল ঘুরে। আর আসতে পারবি কিনা কে জানে। এই সুযোগ এই সুযোগ এই সুযোগ।

জয়ন্তর মনে হল, বাড়িটা একটা মানুষ। তাকে ডাকছে দু'হাত বাড়িয়ে। দৌড়ে যেতে গিয়ে বাজ পড়ার আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে রইল। চমক ভাঙল। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল, পূবদিকটায় একটা কাঠের সাঁকো।

পায়ে পায়ে এলো জয়ন্ত।

সাঁকো দিয়ে চলেছে অচ্ছন্নের মতো। সারা শরীরটায় একটা হিম-হিম অনুভূতি। এসে পৌঁছুল বাড়ির সিংদরজায়। দরজা বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিল, ঘুষি মারল। দরজা খুলল না কেউ। এলো না ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ। ভেতরে লোক আছে বলে মনে হ'ল না।

সরে এলো পাশের দরজায়। ধাক্কা মারতে কড়কড় শব্দে খুলে গেল। খিল আঁটা ছিল না ভেতরে। এমনি ভেজানো ছিল। ভেতরটা অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে দেখছে জয়ন্ত। সমস্ত ঘরেরই দরজা-জানলা বন্ধ। খিল-ছিটকিনি আঁটা না ভেজানো, দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

দিনের আলোয় দেখে, দিনের আলোয় ফিরে যাবে ভেবেছিল, তা আর হল না। প্রকৃতি বাদ সাধল। জয়ন্তর মনে হচ্ছে, কতশত মানুষের নিশ্বাস ঠাণ্ডা বাতাসে মিশে রয়েছে। গা স্পর্শ করে করে ঠেলছে যেন ভেতরে—অন্দর মহলের দিকে। আঙিনা পেরিয়ে অন্দর মহলে ঢোকার মুখে বাদুর-চামচিকি ডানা ঝটপট

করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। বিচ্ছিরি ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু চলার বিরতি নেই জয়ন্তর।

দু'সারি ঘরের মধ্যে ডানদিকের শেষের ঘরটা থেকে কাঁপা-ক্ষীণ আলো বেরিয়ে আসছে দালানে। দরজার সামনে এসে থামল।

ক্ষীণ আলোটা নিভে গেল। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে।

জনপ্রাণীশূন্য বাড়িতে মানুষের নিশ্বাসের মতো এ কার নিশ্বাস? অজগর নয় তো? টর্চের আলো ফেলল ভেতরে। জলজ্যান্ত মানুষ একজন। বুকে বালিশ দিয়ে হাঁপাচ্ছে বৃদ্ধ। জয়ন্ত প্রবেশ করল। জয়ন্তকে দেখেই চমকে উঠল বৃদ্ধ। ভাঙা থরথরে গলায় বলল, কে—সূর্যনারায়ণ? বলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ল বৃদ্ধ। মাথাটা ঢলে পড়ল তাকিয়ার ওপর।

জয়ন্ত মাথাটা তুলে ধরল সযত্নে ডানহাতের ওপর। টুলে রাখা কাঁসার গেলাসের জল ছিটিয়ে দিল মুখে চোখে। বৃদ্ধ জ্ঞান ফিরে পেল! নিজেকে সামলে নিয়ে কুলুঙ্গির দিকে চোখ মেলে ধরল। পিতলের ঘটিপিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের প্রদীপটা জ্বেলে দিল জয়ন্ত। মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বৃদ্ধ বলে উঠল, সূর্যনারায়ণ! বোসো। বোসো। ঠিক সময়ে এসে পড়েছো!

আমি জয়ন্ত। সূর্যনারায়ণ আমার বাবা!

মুখখানা হুবহু সূর্যনারায়ণেরই মতো। সে তো বটে। সূর্যনারায়ণ এখন এ বয়সের হবে কেমন করে! বছর কুড়ি আগে একবার দেখেছি তাকে। তাও লুকিয়ে। তখন কতই বা বয়স ছিল! কুড়ি কি বাইশ। সেই চেহারাটাই মনে আছে।

কিছু মনে করবেন না। আপনার পরিচয় জানতে পারলুম না তো।

আমার পরিচয় জানতে পারবে সব। একটু থেমে আবার বলতে লাগল:

একা নির্বান্ধব পুরীতে পড়ে আছি। যারা শেষ হবার, তারা শেষ হ'ল এই বাড়িতে। যারা চলে যাওয়ার তারা চলে গেল দেশ ছেড়ে। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে। সাঁঝ সকালে শিবমন্দিরে ধূপধুনো দেওয়ার কেউ নেই? ভিটেতে বাতি জ্বালানোরও নেই কেউ। চলে গেছলুম। থাকতে পারলুম না আমি। ফিরে এসে রয়েছি। দিন গুণে চলেছি। কেউ এসে পড়লে মরণেও শান্তি আমার। সব জানিয়ে সব না বলে মরলে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে না যে।

দু' চোখের জলে দু' গাল ভাসল বৃদ্ধের। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে পড়েছে।

ভিজে প্যান্টসার্ট ছেড়ে, আলনা থেকে একখানা ধুতি নিয়ে পরতে বলল বৃদ্ধ জয়ন্তকে।

জয়ন্ত পরল।

হাতের ইশারায় কাছে এসে বসতে বলল বৃদ্ধ।

জয়ন্ত বসে আছে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে।

বৃদ্ধও একদৃষ্টে দেখছে ওকে। কি যেন ভাবছে। জোরে নিশ্বাস ফেলছে মাঝে মাঝে।

বলল, সমস্ত শুনবে তুমি। কিছু খেয়ে নাও তার আগে।

—খিদে নেই আমার। কিচ্ছু ভাববেন না।

—তা কখনো হয় নাকি?

—উঠতে যাচ্ছিল বৃদ্ধ, বাধা দিল জয়ন্ত। যেতে হবে না আপনাকে।

বৃদ্ধের পরিচয় জানার এত আগ্রহ জয়ন্তর, খাবার স্পৃহা চলে গেছে একদম। বলল, আর কোন কিছুর দরকার নেই।

—শুনেছি সূর্যনারায়ণ খুব খেতে পারত। যে কেউ খেতে বললে কত না খুশি। ভোলানাথ! তার ছেলে হয়ে তুমি···এখনও খায় তো?

বাবা নেই।

—নেই? সেও চলে গেল! কবে?

—বছর দশেক আগে। আমি তখন পনেরোয় পা দিয়েছি।

নিভু-নিভু হয়ে আসছিল প্রদীপটা। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সলতে উসকে দিল বৃদ্ধ। চিকচিক করছে ছ'চোখ? ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। বলল, হাঁপানিটা তো সারাজীবনের সঙ্গী। মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু কষ্ট তো দেবেই।

টুল থেকে জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল একবার। ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল।

—তোমাকে আবার পাবো কি না পাবো তার ঠিক নেই। আমিও আর থাকবো কি না থাকবো তারও ঠিক নেই। চল, একটা ঘর দেখাই তোমায়। সে ঘরটা বন্ধই থাকে। আমি ঢুকতে দিই না কাউকে। তালা বন্ধ। তোমাকে দেখাবো। অনেক কিছু বলবো। যা কেউ জানে না কেউ জানে নি। মানুষ না জানুক, সে কথা বেঁচে আছে এখানকার মাটিতে রোদ্দুরে আকাশে বাতাসে। আর বেঁচে আছে এই সত্তর বছরের বুড়োর চামড়া ঢাকা পাঁজরা ঢাকা বুকের মধ্যে।

একটু থামল বৃদ্ধ, একটু দম নিল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠল আস্তে আস্তে। লাঠিটা হাতে নিয়ে, ঠুকঠুক শব্দ করতে করতে বেরোল ঘর থেকে। পেছু ফিরে তাকাল। জয়ন্ত আসছে।

এক ছুই তিন চার···ছয় সাত। সাতটা ঘরের দরজা পেরিয়ে আট নম্বর ঘরের দরজা খুলল পৈতেয় বাঁধা চাবিকাঠি দিয়ে। বাইরের বাতাস হু-হু করে ঘরে ঢুকল। ঝুরঝুর করে যেন পাহাড়ের চুড়ো থেকে তুষার খসে খসে পড়তে লাগল ঘরময়। কড়িকাঠ থেকে মেঝেয়। দেয়াল থেকে দেয়ালে।

একি দৃশ্য দেখছে জয়ন্ত!

ছ'চোখ রগড়ে নিয়ে ভালো করে তাকাল। গোটা ঘরটায় এক হাঁটু ধুলো উড়ছে, উঠছে নামছে ঘুরছে। ধোঁয়া নয়, তুষার নয়। একটু দাঁড়িয়ে রইল ছুজনে বাইরে।

বৃদ্ধ প্রদীপটা নিয়ে আসতে বলল।

হন্তদন্ত হয়ে নিয়ে এলো জয়ন্ত। বৃদ্ধের ইঙ্গিতে রাখল ঘরের মাঝ-

খানে। ঘরে ঢুকেছে বৃদ্ধ। জয়ন্ত অনুসরণ করেছে।

বৃদ্ধ বলল, এই ঘরেই এ বাড়ির প্রত্যেকে এসেছে একদিন। নতুন খাতায় লিখেছে তাদের বিশেষ দিনের কথা বিচিত্র ঘটনার কথা। এক দিনের পুরনো খাতার পাশে আর একদিনেব নতুন খাতা সাজানো হয়েছে নতুন করে। একটা একটা করে ঘর ভর্তি তাকে তাকভর্তি খাতা। এ ঘরখানার নাম খাতার ঘর। কর্তারা বলত, যখন কেউ থাকবে না, তখন এই সমস্ত খাতার পাতায় বেঁচে উঠবে মরা মানুষ। তাদের রহস্যময় জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাবে।

জয়ন্তর চোখ মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করছে বৃদ্ধ। জয়ন্ত তার মুখ থেকে শুনতে চায়, না খাতার আঁচড় থেকে জানতে চায়?

বৃদ্ধ ঘর ছেকে বেরিয়ে গেলে, জয়ন্ত বাঁচে। আসার সময় এই বাড়িটা দূর থেকেও একটা মোহ বিস্তার করেছিল তার চোখে। অত বাধা-বিঘ্নতেও ডেকে এনেছিল। তাকের সাজানো খাতা সেই মোহই বিস্তার করছে আবার। খালি মনে হচ্ছে, রাতভোর খাতা পড়ে শেষ ক'রে ফেলে। নিজেকে সংযত করে রাখতে পারল না।

বৃদ্ধের আদেশ না নিয়েই তাকের প্রথম থাকের প্রথম খাতাখানা খপ্ করে টেনে বার করল। জরাজীর্ণ খাতা আর পড়তে হ'ল না। হাতের খাতা হাতেই গুঁড়িয়ে ঝুর হয়ে ঝরে পড়ল ধুলোয়।

ধুলো হাতড়ে পাতার টুকরো খুঁজতে চেষ্টা করেছে পায়নি। ধুলো ধুলোয় মিশে একাকার হয়ে গেছে।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে জয়ন্ত। আপসোসের অন্ত নেই। কি অন্যায় না করল, না বুঝে হাত ঠেকিয়ে। বোধ হয় একটা বিশেষ জানার জিনিস হারিয়ে গেল বরাবরের জন্য।

অপরাধী মুখ ক'রে পেছন ফিরে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধের স্থির দৃষ্টি। মুখ গম্ভীর। বলল, খাতা হারিয়ে গেলে, ঘটনা হারিয়ে যাবে না কখনো কোনদিন। মিহিমিহি ধুলোতে এক ঘটনা হাজারো হয়ে বেঁচে থাকবে। বাতাসে বেয়ে বেয়ে লোকের

কানে পৌঁছুবে, লোকের মনে পৌঁছুবে। লোকে ভাববে কল্পনায়, দেখবে স্বপ্নে। দুঃখু করার কিছু নেই।

জয়ন্তর খাতা নেবার লোভ আবারো জেগে উঠছে। আর নয়। এঘর থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ঘরটা যেন তাকে জোর করে আটকে রাখছে। আটকে রাখবেও বুঝিবা। পা দু'টো মেঝে থেকে তুলতে পারছে না।

আশ্বাস পেলে মানুষ নিবৃত্ত হতে পারে কি সেই কাজ থেকে? প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেখানে শঙ্কাসঙ্কোচের স্থান আছে কি সেখানে কখনো কোন কালে?

জয়ন্তর বেলায়ই বা ব্যাতিক্রম ঘটবে কেন? জয়ন্ত হাত বাড়াল পাশের খাতাটা টেনে নেয়ার জন্য। একটা নতুন অনুভূতিতে আশ্চর্য হয়ে গেল। মেঝেয় আটকানো দু'পা আলগা হয়ে গেল যেন। সত্যি সত্যিই চলার শক্তি ফিরে পেল বুঝি জয়ন্ত।

এবারে কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে পালানোর ইচ্ছে নয়, খাতার কাছে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। এগোল। এ খাতাটা হাতে নিতে ধুলো হয়ে গেল না বটে, কিন্তু মচমচে পাতা ভেঙে অনেক টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

সব কটা টুকরো এক ক'রে দেখছে জয়ন্ত একদৃষ্টে।

বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছে। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

ঝুঁকে পড়ছে সামনের দিকে। বসল চৌকিতে। জয়ন্ত কি ভাষায় কি লেখা বুঝতে পারছে না।

বৃদ্ধ বলল, আরবী। ওটা আমিও জানি না।

তাকে তুলে রাখবার জন্য মলাটের ওপর সাজাচ্ছিল জয়ন্ত, বৃদ্ধ বারণ করল। —দরকার নেই। যেমন আছে, তেমনি থাক। ওদের বন্দীদশা ঘুচল তোমার জন্য, আবার বন্দী করা কেন?

বৃদ্ধ যেন এক রহস্যময় পুরুষ। রহস্যে ছেয়ে আছে দু'চোখ। চোখ ফেরাতে এইটাই জয়ন্তর মনে হল। বৃদ্ধ চেয়ে নেই এবার তার

দিকে। দৃষ্টি আটকেছে একেবারে নিচের তাকের শেষ সারিতে।

শেষ সারির খাতা দেখার জন্য, জয়ন্ত কেমন হয়ে উঠল। অস্থির-উৎসুক।

একখানা খাতা টেনে বার করল। প্রথম পাতাটা খালি। দ্বিতীয় পাতায় বাংলায় লেখা। ভূষোকালিতে। খগের কলমে বোধ হয়—হরফ মোটা-মোটা। —অনেক যন্ত্রণা অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি। যাহার জন্য এত বিষয়-আশয় করিলাম, মরিলে যাহার সর্বস্ব, সেই লোকনাথ আমার ঘুমন্ত অবস্থায় বুকের ওপর উঠিয়া বসিল। চিৎকার করিয়া ঘুম ভাঙাইয়া বলিল, তোমায় গলা টিপিয়া খুন করিব সম্পত্তি আমার নামে লিখিয়া না দিলে।

লোকনাথের অকস্মাৎ এই ব্যবহারে আমি অতিশয় আঘাত পাইয়াছি। তাই পুত্রকে ভরণপোষণের জন্য যৎসামান্য দিয়া, পৌত্র কিশোরীমোহনকে আমার স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু বর্তমান—দান করিলাম।

তীর্থযাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে কাশী যাত্রা করিতেছি। জানি না বাবা বিশ্বনাথের কি ইচ্ছা। পাল্কিতে অতখানি রাস্তা, পথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব। প্রাণ লইয়া পৌঁছাইব, না রাস্তায় প্রাণ খোয়াইব, তাও জানি না।

এই অবধিই লেখা। খানিক ফাঁকের পর নিচে টানা লেখায় নাম সই করা।— রামহরি শর্মা।

লেখায় দু'চোখ বুলোচ্ছে জয়ন্ত বার বার। ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপর। ভাবছে, রামহরি শর্মা কি কাশীতে পৌঁছতে পেরেছিল, না পথে—

জয়ন্তর পা থেকে মাথা আর মাথা থেকে পা অবধি শিরশিরে ভয় দ্রুত ওঠানামা করতে শুরু করেছে। চোখের সুমুখ থেকে লেখার হরফ মুছে যাচ্ছে। ফুটে উঠছে তার জায়গায় দুর্গম পথের ছবি।

কি ভয়ানক জঙ্গল। সূর্যের আলো প্রবেশ করে না একদম।

পাল্কি বেহারাদের গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না মোটে। নাক দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছে স্রেফ। লাঠি-তীরধনুক-বল্লম হাতে হারে-রে-রে শব্দ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাকাতের দল পাল্কির ওপর।

তীর্থযাত্রী বৃদ্ধ রামহরি শর্মা জোড়হাত করে বেরোল পাল্কি থেকে। করুণ চোখ। বলতে যাচ্ছিল কি, বলা আর হ'ল না। চতুর্দিক দিয়ে আছড়ে পড়ছে লাঠির পর লাঠি। বয়ে যাচ্ছে রক্তগঙ্গা।

জয়ন্ত দেখতে পারছে না। কি শোচনীয় মৃত্যু! হাতে খাতা আছে খেয়াল নেই। চোখে হাত চাপা দিতে গিয়ে মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে গেল খাতাটা। কাঠের মলাটের শব্দ হ'ল খট করে। জয়ন্ত চমকে উঠল। নির্জন ঘরে বাজ পড়ার আওয়াজ শুনল বুঝি। সম্বিৎ ফিরে পেল। ধড়াস ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর!

বৃদ্ধের কাছে এসে বসল। দম নিল। একি চিন্তা এলো তার মাথায়! ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ঘোর লেগেছিল চোখে ক্ষণিকে জন্য।

মাঝে মাঝে চেতনা আসছে, খাতার কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তখুনি আবার নিশি পাওয়ার মতো খাতা পেয়ে বসছে। তাকাচ্ছে বৃদ্ধের দিকে। তাকের ওই দিককার খাতা ছাড়া আর কোন দিকেই লক্ষ্য নেই বৃদ্ধের। বৃদ্ধও যেন কিরকম হয়ে গেছে। কোথায় কোন্ দূরে চলে গেছে দৃষ্টি। এখানে দেহখানা। তবু যেন ও নিজে নেই এখানে।

যে খাতাটা পড়ে রয়েছে মুখ থুবড়ে, সে খাতাটা তুলতে আর মন চাইছে না জয়ন্তর দুঃস্বপ্নের কথা ভেবে। আবার খাতা দেখার কৌতূহলও বেড়ে উঠেছে চতুর্গুণ। নিস্পৃহ হতে পারছে না। উঠল, টেনে নিল পরের খাতাটা।

বসল এসে চৌকিতে।

পাতা ওল্টাচ্ছে।...চার, পাঁচ। কিচ্ছু লেখা নেই। কালির আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে নি। ছয় লেখা আছে মধ্যিখানে। ওপর

ফাঁকা নিচে ফাঁকা।···চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন কিশোরীমোহন শর্মা। এর ঠিক নিচেই স্ত্রীলোকের হাতের গোটা গোটা লেখা। এই বাড়ির নববধূ হইয়া আজ আসিলাম। চন্দ্রমণি দেবী।

চন্দ্রমণি দেবী! জয়ন্তর এ নাম শোনা। একবারটি মাত্র কাছে গেছল। তারপর চুপচাপ। নামের মানুষকে জানার চেষ্টা করেছিল, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যতবার নাম তোলা হয়েছে, ততবার অন্য প্রসঙ্গ এনে চাপা দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রমণি সম্বন্ধে জানার জন্য পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে জয়ন্ত এক নিশ্বাসে। আশ্চর্য! সব পাতাই খালি। না লিখেছে কিশোরী মোহন, না লিখেছে চন্দ্রমণি। দু'জনের কেউই কোন কথা লিখে পাতা ভরায় নি।

এ খাতাখানা পাশে রেখে দিয়ে, পরের খাতায় চোখ মন এক করে দেখতে শুরু করল জয়ন্ত। যদি কিছু পাওয়া যায়। পেল! চন্দ্রমণি লিখেছে, উনি কাল রাতে খুন হয়েছেন। এ লেখাটা কাঁপা হাতের। লেখার প্রত্যেক অক্ষর কেঁপে উঠে বেঁকে গেছে।

এ খাতাতে ওইটুকু লেখা ছাড়া সমস্ত পাতাই ফাঁকা।

চন্দ্রমণির সম্বন্ধে জয়ন্ত জানতে পারল না। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রইল। এ নিরাশায় আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না কোন দিক থেকে। না পেলেও, খাতার আকর্ষণ কমছে না এতটুকু। ওই একটা আকর্ষণই পাগল করে রেখেছে তাকে। পাগল করে তুলছে আরো! কৌতূহল উৎকণ্ঠা উত্তেজনা জাগিয়ে রাখছে। থিতিয়ে পড়তে দিচ্ছে না।

এবারের খাতাটায় চন্দ্রমণির মৃত্যু সংবাদ লেখা রয়েছে। লিখেছে সূর্যনারায়ণ।—মা আজ এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের জন্য।

খাতাটার শেষ পাতায় লেখা—মায়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে! আমি সপরিবারে কাশী চলে যাচ্ছি। এ বাড়ির দীর্ঘ ইতিহাসের

দীর্ঘ নিশ্বাসের সীমানা থেকে আমার বংশধরকে সরিয়ে রাখতে চাই। সূর্যনারায়ণের সই রয়েছে।

পরের খাতাখানা হাতে নিয়ে মলাট খোলার মুখে একটা দমকা কাশিতে কাতর হয়ে পড়ল বৃদ্ধ। বুকে-পিঠে মাথায় হাত বুলোতে কাশির জোর কমল একটু। বৃদ্ধ বলল, এরকম তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা লেগেই আছে খকর-খকর। মরণ হচ্ছে তবু কই। এ বড় কঠিন জান। নাও, গ্যাখো তুমি। আমি ঠিক আছি।

জয়ন্ত দেখছে।

নতুন জিনিস। বাংলা হরফে উর্দু-গজল। বাংলা তর্জমাও করা রয়েছে।

জ্বলনে কো শমা বানে,
মিটনে কো পরয়ানা বানে।
দিল জ্বলে থাক্ বানে,
থাক্ সে পয়মানা বানে···।
নিজেকে জ্বালিয়ে রেখে
প্রদীপ শুধু জ্বলে,
হারানোর নেশায় পাগল
পতঙ্গ ছুটে চলে।
নিঃশেষের ভস্মটুকু
মাটির বুকে,
প্রাণ ফিরে পায় যেন
সমাধির স্তূপে,
সেই প্রাণ সেই মাটি—
নতুন প্রদীপ আবার,
জ্বলে ওঠে শিখা তার,
খুসির জোয়ারে আসে
পতঙ্গ ভেসে ভেসে,
নিজেকে হারাবে বলে।

কে লিখেছে, নাম সই নেই। বাংলায় মানে বুঝেছে বলে উর্দু শব্দ বড় সুন্দর লাগছে। আবার পড়ছে। উচ্চারণ ক'রে ক'রে। এবারেও অদ্ভুত অনুভূতি।

নিজের গলা শুনতে শুনতে সেই গলায়ই কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। সুরেলা মিঠে আওয়াজ। শুনছে জয়ন্ত—তরুণী কণ্ঠের মনমাতানো উর্দু গজল।

তন্ময় হয়ে শুনছে গান, শুনছে ঘুঙুরের আওয়াজ, সারেঙ্গী বাজনা।

জয়ন্তর তন্ময়তা ভেঙে খানখান হয়ে গেল বৃদ্ধের কাশির শব্দে। অনেক উঁচু থেকে ধপাস করে পড়ে গেল যেন মেঝেয়। গান বন্ধ। নাচ ঘুঙুর-সারেঙ্গীর সুরের খেলাও নিস্তব্ধ।

নিজের অগোচরেই বলে উঠল জয়ন্ত, একি হ'ল। অমন গান মাঝপথেই শেষ !

বিস্ময়ঝরা গলায় বলল বৃদ্ধ, কি গান ? কি গান শুনলে তুমি ? আমি তো কই কিছু শুনতে পেলুম না। খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে বড় বড় চোখ করে দেখল। বুকভাঙা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। বলল, এ গান শুনতে পাওয়া যায় এখনো ? আরো কি বলতে যাচ্ছিল বৃদ্ধ, সংযত করে নিল নিজেকে। বলল, পড় পড়। তুমি পড়ে যাও। গলা খসখস করলেই মুখে হাত চাপা দোব। আর কোন গোলমাল হবে না।

জয়ন্ত পড়ছে।

এ গান সর্বনেশে। বাড়িটার আকাশে অভিশাপের কালো মেঘ ছেয়ে যাওয়ার মূলে এই একটিমাত্র গানই যথেষ্ট। গুলাবীবাই যখন প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে এ গান গাইতো, তখন বনের হিংস্র পশুও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ত। সুরের এমন মাদকতা যে মদ না খেয়েও মাতাল হয়ে পড়ত মানুষ।

কিশোরীমোহনকে মাতাল করার প্রয়োজন ছিল। তা না হলে ছায়ার মত পেছু পেছু ঘুরে বেড়াবে কেন বীরেন্দ্রপ্রসাদ !

গুপ্ত রহস্য আজ আর প্রকাশ করতে দ্বিধা নেই। কিশোরী-মোহনের খুনের কথাও। বরং না করলে, সত্যের অপলাপ করাই হবে।

এই পর্যন্ত লেখা। তারপর আবার খানিক জায়গা ছেড়ে দিয়ে লেখা শুরু।

শান বাঁধানো পুকুর পাড়ে ছিপ হাতে ক'রে ব'সে আছে কিশোরী-মোহন। রোদ্দুরটা পেছন দিকে, তাই কার ছায়া পড়ল সামনে। কিশোরীমোহন ঘাড় ফেরাল। অবাক। বীরেন্দ্রর হাতের টাঙিটা ঘাড়ের দিক থেকে সরে গেল সট করে! উঠে দাঁড়াল কিশোরীমোহন। বিরেন্দ্রর অট্টহাসিতে পুকুরে কালো জলে ঢেউ তুলে উঠল।

—কি রে, ভয় পেয়ে গেলি কিশোর? আমার চেয়ে তো তোর দ্বিগুণ শক্তি। ছ্যাখ টাঙিটা হাতে নিয়ে একবার।

কিশোরীমোহন হাতে নিল না তবে দেখল। রক্তমাখানো।

—কার রক্ত ভাবছিস? দেখবি তো আয়। তোর শত্রুর রে। বলে, হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল বীরেন্দ্র আম-বাগান অবধি।

—দেখেছিস? তোর দিকে মুখ করেই ছুটছিল। আমি না এসে পড়লে হয়েছিল আর কি। ভাবতে বুক কেঁপে ওঠে।

বিরাট কেউটেটা চার টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে।

প্রাণ ফিরে পাওয়ার কৃতজ্ঞতা জানাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে কিশোরীমোহন বীরেন্দ্রকে। গদগদ গলায় বলল, তুই ছাড়া এমন আর আছে কে আমার?

যাক অত আর বাড়াতে হবে না। কোন দিকে লক্ষ্য রাখবি নি তুই। যত হয়েছে আমার জ্বালা। এমন আপনভোলা হলে বিষয় কর্ম্ম চলে নাকি?

বিষয়ী মানুষ চতুর্দিকে নজর থাকবে তা নয়, ছিপ নিয়ে কাটাবে

সারা দিন। পেছনে যে একটা কাল আসছিল সে খেয়াল নেই। বিষয়ী লোকের পেছনেও দুটো চোখ থাকে। বুঝলি হাঁদারাম কোথাকার।

—তুই তো চোখ রয়েছিস।

—এ চোখ যদি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে তখন ?

—এ হবার নয়।

—এ হবার নয়। মুখ ভেঙচে বলল বীরেন্দ্র।

দু' জনের কাঁধে দু'জনে হাত রেখে খোশমেজাজে গল্প করতে করতে চলতে লাগল। জাম গাছের তলায় এসে বসল পাশাপাশি।

মিটিমিটি হাসছে বীরেন্দ্র।

—আঃ ম'লো অত হাসছিস কেন ?

—হাসির ব্যাপার আছে। তা না হলে কি আর হাসছি ? বল দিকিনি কেন হাসছি ?

—আমি তো আর জ্যোতিষী নই যে গণনা করে বলতে পারবো। যোগীও নই যে, ধ্যানে মনের কথা বুঝে নেবো।

—চন্দ্রমণির কথা ভাবছি। রূপ আছে, সুকণ্ঠ। তা বলে গুলাবী বাই তাকে চুরি করে নিয়ে আসবে ? তুই থাকতে ? হাসির কথা নয় কিনা বল ?

কিশোরীমোহনের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। গলার স্বরও। বলল, গুলাবীবাইয়ের সে আশা বৃথা। রাধাও নাচবে না, সাতমণ তেলও পুড়বে না। হ্যাঁ, একটা কথা। চুরির দিনক্ষণ কবে শুনি ?

—চোর বুঝি আবার দিনক্ষণ বলে বেড়ায় নাকি ? সৃষ্টিছাড়া কথা-বার্তা তোর। সুযোগ সুবিধে পেলেই করবে। সে আজ যদি হয়, আজ—কাল যদি হয়, কাল।

—এখুনিই ব্যবস্থা করছি আমি।

করেছে কিশোরীমোহন। যেখান-যেখান দিয়ে চন্দ্রমণির বাড়ি যাওয়া যায়, সেই রাস্তায় পাইকবরকন্দাজ হাজির রেখেছে। কোন ডুলি কোন পাল্কি দেখলে, ভেতর অবধি তল্লাস না ক'রে যেন ছাড়া না হয়।

কড়া হুকুম দিয়েছে। গাফিলতি করলে রেহাই পাবে না কেউ। জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে মাটিতে।

গুলাবীবাইয়ের মহলের চারপাশেও পাহারা। বেরোতে যেন না পারে। গুলাবীবাই নজরবন্দী।

খবর পেয়ে সাপিনীর মত ফুঁসে উঠেছে গুলাবীবাই। দেখা যাবে কিশোরীমোহন কত বুদ্ধি ধরে।

সকলেই দেখেছে, সকলেই শুনেছে।

আগের গুলাবীবাই ফিরেছে আবার। দিন রাত গান নিয়ে মাতোয়ারা। নাওয়া-খাওয়া ভুলতে বসেছে। আসে কিশোরীমোহন। নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায় গানের সম্মোহনী শক্তিতে। গান থেমে গেলেও সুরের রেশে মন বিভোর হয়ে থাকে।

গুলাবীবাইয়ের জন্য ওর ধর্ম মাকে অনেক নজরানা দিতে হয়েছে। একটা দৌলতই দিয়েছে বললে হয়। তবে পরদেশী সাহেবের সঙ্গ ছেড়েছে ধর্ম-মা। তা ছাড়া গুলাবীবাইয়েরও যে সম্মতি ছিল না, তা নয়। গুলাবীবাই বিশজনের মনোরঞ্জন করে করে হয়রান হয়ে পড়েছিল। বিশজনের মন বুঝে বিশ রকমের অভিনয় করার চেয়ে একজনের মনের খবর জানা সহজ। সহজ মেলামেশায় নিজের ওপর বিতৃষ্ণা আসে না অত। একটু শান্তি—আনন্দ পাওয়া যায়।

লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়ে কিশোরীমোহনকে এক রকম জোর করেই গুলাবীবাইয়ের গান শোনাতে নিয়ে যায় বীরেন্দ্র। কিশোরীমোহন রাজী ছিল না। বাপের ধাত পায়নি। বাপ তো বাইশ বছরে বাষট্টি রকমের নেশায় মশগুল। বিষয় থেকে একরকম বঞ্চিত বলে, ছেলেকে টেক্কা দেয়ার জন্য অনেক পয়সাই করেছিল অনেককে পথে বসিয়ে। তাছাড়া চরিত্রদোষ যা ছিল, সে আর কহতব্য নয়। সামনে দিয়ে কুরূপাই হ'ক আর সুরূপাই হোক—কোন মেয়ের যাওয়ার উপায় ছিল না।

কিশোরীমোহন সে হিসেবে স্বতন্ত্র। হ'লে হবে কি—একা গুলাবীবাই শত মেয়ের রূপ ধরে দিনরাতে। সদাসর্বদা চোখেচোখে

রাখে কিশোরীমোহনকে। এটা অবিশ্যি কিশোরীমোহন বোঝে না। এমনই মোহ-অন্ধ। বোঝে বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্রর প্ররোচনায়ই গুলাবীবাই অন্দরমহলে। বাড়ির কর্তারা বাইরে যা করুক, অন্দর মহলকে শুচিশুভ্র রাখতে চাইত। কিশোরী মোহনের বাবা লোকনাথেরও সে নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু কিশোরীমোহনের পুরোনো সংস্কারে বিপ্লব নিয়ে আসার নামে ধ্বংসকে বরণ করে ডেকে নিয়ে এলো।

গুলাবীবাইয়ের ওপর প্রতিপক্ষ ধনীদের নজর পড়েছে। গুলাবী-বাইয়ের উড়ুউড়ু মন। অন্দরমহলে রাখাই শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

যুক্তি শুনে খুশী কিশোরীমোহন। আঙুলের হীরের আংটি খুলে বীরেন্দ্রের আঙুলে পরিয়ে দিল।

আর গুলাবীবাইও নিজের মুক্তোর আংটিটা বীরেন্দ্রর হাতে গুঁজে দিল।

গুলাবীবাই আনন্দে আটখানা। কতবড় না সম্মান পেল। বাঁড়ুয্যে বংশের অন্দর মহলে গুলাবীবাই। সব চেয়ে বেশী উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, সে আর কেউ নয়। স্বয়ং বীরেন্দ্র। বাঁড়ুজ্যে বংশের মুখে চুণকালি মাখাতে পেরেছে, এই তার মস্ত পুরস্কার।

মাথা খেলাতে হয়েছে তাকে দুদিকে। গুলাবীবাইকে বলেছে, তোমাকে যা শিখিয়ে দোব, তোমার ভালোর জন্য। তোমাকে বড় করার, সমাজে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আমারই বেশি। আমিই এনেছি তোমাকে এখানে। উদাসীন-উদাসীন ভাব দেখাবে ওকে। কি হয়েছে তোমার জিজ্ঞেস করলে বলবে—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কেবলি মনে হচ্ছে, কতদূরে চলে গেছি আমি। আর কতদূরে যাচ্ছি। সে দূরের শেষ নেই বুঝি। ব্যাস এই পর্যন্ত। আর হাজারো প্রশ্নেও কিন্তু মুখ খুলবে না! খুব সাবধান!

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে, আবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে গুলাবীবাইয়ের। এদিক ওদিক চেয়ে দেখেছে, কেউ আছে কিনা,

কেউ আসছে কিনা। ফিসফিস করে বলেছে, তোমার এরকম হওয়ার কারণ কি—যা বলার আমি বলবো। সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

চৌকাঠের ওপারে পা রাখতেই কিশোরীমোহনের সঙ্গে দেখা! আসছিল। চমকে উঠতে গিয়েও সচেতন হয়ে উঠল চোখের পলকে। সহজ-সরল ভঙ্গীতে বলল, গুলাবী ডেকে পাঠিয়েছিল। কেমন যেন হয়ে গেছে ও। বলে, কিচ্ছু ভালো লাগছে না। এবিষয়ে অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে। নিরিবিলিতে বসে ভাল করে আলোচনা করতে হবে।

শোনার অধীর আগ্রহে কিশোরীমোহন বলে উঠল, এখুনি বল না।

—না গুলাবীবাই টের পাবে। এসে পড়তে পারে। কিশোরীমোহনের প্রশ্ন করার আগেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল বীরেন্দ্র।

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল কিশোরীমোহন।

কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে অর্ধশয়ানে গুলাবীবাই। ফিনফিনে গোলাপী শাড়ীর সোনালী জরির আঁচল লাল কার্পেটে লুটোপুটি খাচ্ছে। দু'চোখের দৃষ্টি জানলার বাইরে। আকাশে। চোখের কোণে জলের কণা। মাঝে মাঝে বুকখালি করা নিশ্বাস ঝরে পড়ছে একটা। কে ঘরে ঢুকল, কে কাছে এসে দাঁড়াল না দাঁড়াল—কোন খেয়াল নেই।

স্বচক্ষে গুলাবীবাইয়ের অবস্থাটা দেখল কিশোরীমোহন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো জয়ন্তর বীরেন্দ্রটা তো শয়তান বটেই, কিন্তু গুলাবীবাইও তো কম যায় না। বরং এককাঠি ওপরে দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধ বলল, এতো শীগগির উত্তেজিত হয়ো না। বীরেন্দ্রর অন্য কীর্তিকলাপের তুলনায় এটা তো কিছু নয়। পড়, জানতে পারবে'খন। শয়তানের ওপর যদি আরও কিছু থাকে—ও তাই।

আবার খানিকটা জায়গা ছেড়ে লেখা আরম্ভ

মেলাতে ঢোকার ইচ্ছে ছিল না কিশোরীমোহনের। এখানে জোর করে বীরেন্দ্র টেনে নিয়ে এলো। গুলাবীবাইয়ের গানের মতো এও গানের টানে। এ গান আর গুলাবীবাইয়ের গান—দু'টোতে আকাশপাতাল তফাৎ। একজনের মানুষ-স্তুতি, অন্য জনের দেব-স্তুতি।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির ভিড়ে ভিড়।

নাটমন্দিরে বসে গাইছে চন্দ্রমণি।

এলো চুল। কপালে সাদাচন্দনের মধ্যিখানে টকটকে লাল সিঁদুরের টিপ। পরনে লাল পাড় গরদের শাড়ী। পা মুড়ে চোখ বুজে বসে আছে একটি দেবীমূর্তি। বয়স খুব বেশি নয়। ঢলঢলে কচি মুখ। ঠোঁট দুটি নড়ছে কেবল। ওখান দিয়েই স্বর্গীয় স্বর স্বর্গীয় সুর বেরিয়ে আসে।

মানুষের বিশাল সমুদ্র। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ। বোবা হয়ে গেছে ছেলে বুড়ো। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। সকলের দু'চোখ চন্দ্রমণির চোখের জলের দিকে। দু'কান ওর গানের সুরে। কোথায় লাগে গুলাবী বাইয়ের গান, গুলাবীবাইয়ের গলা।

নিজের ভাবে নিজে মগ্ন হয়ে আছে চন্দ্রমণি, পাথরের শিবকে হয়তো জীবন্ত দেখছে। না দেখলে, এমন প্রাণমন উজাড় করা স্তুতি কি করতে পারে ?

> সংকট বিমোচন ত্রিপুরারী ;
> ভক্তরাজ দিয় রিপুদল মারী।
> যে জন জপ করু মন অবধারী,
> সে জন পাও পদারথ চারী।

স্তোত্র শেষ হল। চন্দ্রমণি উঠে দাঁড়াল। চোদ্দ পনেরো বছরের

মেয়েকে মনে হল যেন চব্বিশ-পঁচিশের। 'দেবীজী দেবীজী' বলে, পায়ে হাত টেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল সকলে।

নাটমন্দির থেকে সিঙেশ্বরের মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে চন্দ্রমণি। পুণ্যার্থীরা পথ করে দিচ্ছে দু'ধারে সরে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। মন্দিরে এসে চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। পাল্কি নামানো ছিল, ভেতরে গিয়ে বসল।

পাল্কির পেছু পেছু গিয়ে শাহরশা গাঁয়ের কোন দিকটায় বাড়ি দেখে এলো দু'জনে।

চন্দ্রমণির যে রূপ চোখে ধরেছে, মনে খোদাই হয়ে গেছে কিশোরীমোহনের, সে রূপের কাছে তুচ্ছ গুলাবীবাই।

কুলবধূ হিসেবে চন্দ্রমণিকে ঘরে আনা যায় কি না—কিশোরীমোহন খোঁজ খবর নিতে বলল বীরেন্দ্রকে।

নিয়েছে বীরেন্দ্র। কিশোরীমোহনকে জানিয়েছেও। মধ্যগেরস্ত। বংশের কৌলিন্য আছে। মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ে ও।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কিশোরীমোহন। বিধাতা তার জন্য সব ঠিকঠাক করেই রেখেছে। দেখাটাও অকস্মাৎ। তাদের তুলনায় গরীব বললেই হয়। তা হ'ক, কিছু আটকাবে না। মা-বাবা থাকলে কোন না কোন গোলমালের কথা উঠলেও উঠতে পারত।

মা তো অনেক আগেই গেছে বাবা থাকতে থাকতে। আর বাবা তো বছর দু'য়েক হ'ল নেই। কিশোরীমোহন নিজেই হর্তাকর্তা। যা করবে তাই। যা বলবে তাই। বাধা দেওয়ার কেউ নেই, নিষেধ করার কেউ নেই। বাবা থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। ঠাকুর্দা নিজেই কর্তার পদ থেকে খারিজ করে গেছল তাকে।

যদি অপর পক্ষ অরাজী না হয়, ওই মেয়েকেই বিয়ে করবে কিশোরীমোহন।

কিশোরীমোহনের প্রতিশ্রুতির কথা গুলাবীবাইয়ের কানে তুলল

বীরেন্দ্র। বরাত ভাঙতে বসল যে, আর ঘুমিয়ে থেকে সময় কাটিয়ো না। দু'চোখ খুলে চলতে হবে এবার।

—সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছো যখন তুমি, তখন নামতে যাতে না হয় সে ব্যবস্থা একমাত্র তুমিই করতে পারো।

—পারি। আর সেই ব্যবস্থা করবো বলেই এসেছি। তোমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হবে ভালো করে।

শলাপরামর্শ হয়েছে। চন্দ্রমণিকে চুরি করে এনে বাইজীর ব্যবসায় নামাবে। গুলাবীবাই বেঁচে থাকতে কিশোরীমোহনকে বিয়ে করতে দেবে না কিছুতেই। চন্দ্রমণি কেন কোন মণির সঙ্গেই নয়। চন্দ্রমণির পায়ের তলায় থাকবে না গুলাবীবাই। গুলাবীবাইয়েব পায়ের তলায় থাকবে চন্দ্রমণি।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর পর কিশোরীমোহনের মহলে এসে উপস্থিত হ'ল বীরেন্দ্র। চন্দ্রমণির বিপদের কথা তুলে কিশোরীমোহনকে উতলা ক'রে তুলল।

গুলাবীবাইয়েয় কুটিল জাল ছিন্নভিন্ন করে যে কোন উপায়ে চন্দ্রমণিকে রক্ষা করতে হবেই হবে। বীরেন্দ্রর কথা কিশোরীমোহন মেনে নিয়েছে। পাহারা পড়েছে অন্দর মহল ঘিরে। পাহারা পড়েছে রাস্তাঘাটে।

গানের মদির ছোঁয়ায় কিশোরীমোহন পাগল। কিশোরীমোহনকে ভুলিয়ে আটকে রেখে মনে মনে হাসে গুলাবীবাই। চতুর্দিকে পাহারা থাকলে কি হবে—একদিক যে একেবারে খোলা। অন্দরমহলের সুরঙ্গপথ। ওই পথ দিয়েই নিয়ে আসবে চন্দ্রমণিকে সবার চোখে ধুলো ছড়িয়ে।

পাঁচ মিশেলি রঙের ফরাশ পাতা চৌকির ওপর। রঙবেরঙের মৌসুমীফুল ফুটে রয়েছে যেন। মাথার ওপর মোমবাতির ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ফরাশে বসে গান শোনে কিশোরী-মোহন। গানের রেশ থামার আগেই গুলাবীবাই শুরু করে দেয় আবার গান।

ছন্দে ছন্দে ঘুঙুর বেজে ওঠে। বেজে ওঠে সারেঙ্গী-তবলা। গুলাবীবাইয়ের সুর্মাপরা চোখের ইশারায়। নুয়ে পড়তে পড়তে এগিয়ে আসে কিশোরীমোহনের সামনে। এতক্ষণের চাপাহাসি ঠোঁটের কিনারা ছাপিয়ে উপচে পড়ে এবার। মধুকণ্ঠের মধু ঝরে মৈথিলী গানের মিষ্টি কথায়।

'কে পতিয়া লয়ে জায়ত রে।
মোরা প্রিয়তম পাশ।
হিয় নহি সহয়ে অসহ দুঃখ রে।
ভেল সাওন মাস।

অমাবস্যার নিশুতি রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার! চতুর্দিক নিঝুম নিথর। ঘুঙুরের ফের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গুলাবীবাই খুলে ফেলল পা থেকে। নিশ্বাস বন্ধ করে পা টিপে টিপে কিশোরীমোহনের কাছে এলো। ঘুমোচ্ছে। গান শুনতে শুনতেই ঘুমের ঘোর এসে গেছল দু' চোখে।

নিঃশব্দে নামল নীচে।

সুরঙ্গ-ঘরের দরজা খুলল। বড় মোমবাতি দু'টো জ্বেলেদিল দু' পাশে। অপেক্ষা করছে। গুলাবীবাইয়ের লোকেরা ডাকাতের ছদ্মবেশে গেছে গাঁয়ে। চন্দ্রমণিকে নিয়ে আসবে।

অপেক্ষা ক'রে ক'রে অস্থির হয়ে পড়ল গুলাবীবাই। দু' দিকের প্রহরী সে। ওপরের নিচের। একবার ওপরে উঠছে। দেখে আসছে কিশোরীমোহনকে। নিচে নেমে দেখছে তখুনি আবার—চন্দ্রমণিকে নিয়ে এলো কিনা ওরা।

বার দশেক ওপর নিচে করার পর গুলাবীবাইয়ের উৎকণ্ঠার অবসান হ'ল।

চন্দ্রমণির হাত-পা বাঁধা পিছমোড়া ক'রে। মুখও বাঁধা। শাড়ীর খানিকটায় রক্তের ছিটে। বাবা বাধা দিতে এসেছিল, আঘাত

পেয়েছে। চন্দ্রমণির চোখ পড়লেই দু'চোখ দিয়ে রক্ত ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন।

গুলাবীবাই দেখল চেয়ে চেয়ে। মেয়েটার মধ্যে রূপ আছে। তেজও আছে। প্রৌঢ়গোছের লোকটাকে বলল, সমস্ত বাঁধন খুলে দাও। মা[illegible]র তল্লার ঘরখানাতেই উপস্থিত থাকবে ও। যত্নের ত্রুটি যেন না হয়।

চন্দ্রমণির মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কোন ভয় নেই। তোমার ভালোর জন্যই ওই ভাবে আনা। শিল্পীর কোন জাত নেই, কোন দেশ নেই। কারো কাছে বন্দিনী নয় সে। সে মুক্ত। সে সকলকে আনন্দ দিতে এসেছে। কারো কেনা গোলাম নয়। তুমি জাত শিল্পী। তৈরী হতে হবে। যে কণ্ঠ পেয়েছো—অবহেলা করলে—ঈশ্বরের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না।

চন্দ্রমণি এসব কথার মর্ম বোঝে নি। বুঝতে চায়ও নি। মনের অবস্থাও সেরকম নয়। ওই ভাবে চুরি করে নিয়ে আসে যারা, তারা নাকি ভালোর জন্য করে। ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিল চন্দ্রমণি।

রাতের অন্ধকারে চন্দ্রমণিকে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। খবর লোকের মুখে মুখে রটেছে ভোর না হতেই। ডাকাতরা এসেছিল শুধু চন্দ্রমণিকেই নিয়ে যেতে। মা গায়ের গহনা খুলে দিয়েছে, মেয়েও দিয়েছে, বাপ টাকার থলি সামনে তুলে ধরেছে -- কিচ্ছু নেয় নি।

পড়শী প্রৌঢ়ারা হাসিমস্করা করছে। অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে সিঙেশ্বর তলায় মেলা চলছে। মাসাবধিকাল হতে গেল। এক আধদিন না হয় গেলি, তা নয় রোজ শিবের স্তোত্র গাইতে যাওয়া। কোন রাজপুত্তুরের নজরে পড়ে গেছে।

তা যদি হয় তো বাপটার মাথা ফাটল কি করে?

অমন একটু আধটু না দেখালে লোক কি ভাববে? দেশঘরের ব্যাপার যে।

চন্দ্রমণির কথা তো বটে, পড়শীদেরও মুখরোচক আলোচনা কানে গেল কিশোরীমোহনের।

গানের নেশা কাটল। কাজ সমাধা হয়ে যেতে চৈতন্য উদয় হ'ল। গানে গানে মশগুল ক'রে রাখত গুলাবীবাই বোধ হয় এই জন্য।

গুলাবীবাই গান গাইতে চেয়েছে। দেয়নি কিশোরীমোহন। গুনগুন ক'রে সুর ভেঁজেছে। চুপ করিয়ে দিয়েছে নিষেধ করে। —ওসব বন্ধ করো। আমার সুমুখে বসে থাকো। আমি তোমায় দেখবো অনেক্ষণ ধরে।

বসে থেকেছে গুলাবীবাই খেলনার পুতুলের মতো। কিশোরীমোহন নিষ্পলকে দেখেছে ওকে। কোন ধাতুতে গড়া? ভেতরটা কিসের, বাইরেটা কিসের। গুলাবীবাইয়ের কাছে পরাস্ত হতে হ'ল শেষে। বীরেন্দ্রর কাছ থেকে সমস্ত গোপন সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও। আপসোসের অন্ত নেই কিশোরীমোহনের।

গুলাবীবাইকে ওই অবস্থায় বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বারমহলে এসে বীরেন্দ্রর সঙ্গে পরামর্শ করেছে—কি করে গুলাবীবাইয়ের অজ্ঞাতসারে গুলাবীবাইয়ের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা যায় চন্দ্রমণিকে। গোপন-পরামর্শ বীরেন্দ্র ছাড়া আর অন্য কার সঙ্গে করবে? চন্দ্রমণির এ খবরটা বীরেন্দ্রই সংগ্রহ ক'রে এনেছে। চন্দ্রমণি কোথায় আছে, এও জানিয়েছে। গোলমাল না ক'রে নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করাই ভালো। গুলাবীবাইয়ের অসাধ্য কিছু নেই। এত বড় কাণ্ড যে করে বসতে পারে, সে যে-সে মেয়ে নয়। অনেক বুদ্ধি ধরে। জানাজানি হয়ে গেলে বিভ্রাট বাধা অসম্ভব নয়। চন্দ্রমণিকে এমন জায়গায় সরিয়ে ফেলতে পারে যে, খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক হ'ল গুলাবীবাইকে নেশায় বেহুঁশ করে, সেই অবসরে চন্দ্রমণিকে সুরঙ্গপথ দিয়েই বার ক'রে নিয়ে এসে একেবারে বৌরাণী-

মহলে তুলতে হবে। বৌরাণীমহলের চারদিক আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গোটা বাড়িটার মধ্যে থেকেও ও মহল সম্পূর্ণ আলাদা। কারো প্রবেশের অধিকার নেই। ওখানে রাখলে গুলাবীবাই দাঁত ফোটাতে পারবে না। চন্দ্রমণিকে নিয়ে আসার সময় কিশোরীমোহন নিজে থাকবে ওর পাশে। বীরেন্দ্রই এমতলব দিল অবিশ্যি।

গুলাবীবাইয়ের মহল।

নাচের ঘরটা থমথমে। গুলাবীবাইয়ের মুখখানাও। পায়চারি করছে বীরেন্দ্র ঘরের মধ্যে। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে। দুশ্চিন্তার বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে চাইছে।

মুখের দিকে চেয়ে নিস্পন্দের মতো বসে আছে গুলাবীবাই। দেবতার মুখ থেকে কি আদেশ বেরোয় কে জানে। বীরেন্দ্র তার কাছে দেবতা। কত ব্যাপারেই না বীরেন্দ্র রক্ষে করছে তাকে। সুরঙ্গ দিয়ে চন্দ্রমণিকে নিয়ে যাবে কিশোরীমোহন। বীরেন্দ্র না থাকলে গুলাবীবাই জানতেও পারত না।

ডানহাতের মাঝের আঙুলে কপাল ঘষল বীরেন্দ্র বার দুয়েক। বলল, বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয়া হ'ক সুরঙ্গে। নিশ্চয় চন্দ্রমণি আগে-আগে থাকবে। পেছনে কিশোরীমোহন। কালের ছোবলে অকালে যেতে হবে চন্দ্রমণিকেই। তোমার সুখের ঘরের কাঁটা নির্মূল হয়ে যাবে চিরকালের জন্য। হাসল বীরেন্দ্র। হাসল গুলাবীবাই। খালি গলায় গেয়ে উঠল, কে পতিয়া লয়ে জায়ত রে···।

দ্রুতপায়ে বীরেন্দ্র চলে এলো কিশোরীমোহনের মহলে। চন্দ্রমণি মরুক, এটা সে চায় না। চন্দ্রমণিকে নিয়ে, গুলাবীবাইকে নিয়ে চরম অশান্তির ঝড় বয়ে যাক এ সংসারে, এটাই কাম্য। কিন্তু চন্দ্রমণি তার হয়ে থাকুক—এ বাসনাও মনের গোপনে রয়েছে। গুলাবীবাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুখে বলেছে, অন্তরের কথা নয়।

বলল কিশোরীমোহনকে, ও পথ দিয়ে যাবি না একদম। গেলে আর বাঁচবি না দু'জনে। কেন বাঁচবে না, বাকিটা বলল কানে কানে।

বেদিনীকে মোটা টাকা দিয়ে কালনাগিনী আনিয়ে সুরঙ্গে ছাড়িয়েছে গুলাবীবাই। পণ্ডশ্রম হয়েছে। রাতে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থেকেছে গুলাবীবাই। হুঁস হ'তে নিচে গিয়ে দেখে, চন্দ্রমণি ঘরে নেই। সুরঙ্গের দিকে দৌড়েছে দেখতে—চন্দ্রমণি নীল হয়ে মরে পড়ে আছে কিনা।

পেছন থেকে হাত দু'টো টেনে ধরে আটকেছে বীরেন্দ্র।—যমের মুখে এগিয়ে যাচ্ছো কেন সাত সকালে? চন্দ্রমণিকে ওখান দিয়ে নিয়ে যায়নি কিশোরীমোহন। তোমার জন্যেই ছুটে আসা আমার। আমি জানতুম তুমি এই পর্ব করবে। কালনাগিনী ছাড়া আছে, মনে নেই?,

—মরলে তো ভালোই হ'ত। বাঁচিয়ে লাভ কি হ'ল? জলে ডবডবে হয়ে উঠল গুলাবীবাইয়ের চোখ।

এই দিন থেকে নাচ ছেড়েছে, গান ছেড়েছে গুলাবীবাই। সদাসর্বদা মনমরা। বীরেন্দ্র আসে, বোঝায়—সুদিন ফিরে আসবে আবার। অত ভাবছো কেন? চন্দ্রমণিকে এবাড়ি থেকে আমি সরিয়ে নিয়ে যাবো স্রেফ তোমার জন্য, তোমার শান্তির জন্য। তুমি গান ধর আবার। ওকে নিয়ে আসবো আমি রোজ। ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা কর। তুমি না হলে চন্দ্রমণিকে সরানো মুশকিল হবে আমার পক্ষে।

তীর বেঁধা পাখিটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল আবার। বিষণ্ণ ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটে ওঠে গুলাবীবাইয়ের। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে বীরেন্দ্রর আদেশ।

হলঘরে জমজমাট আসর বসতে শুরু করল নতুন ক'রে। প্রতি সন্ধ্যেয় সারেঙ্গীর ঘেরাটোপ খুলে ফেলা হয়। তবলার চাঁটি পড়ে। ডান কানে হাত চেপে, ডান পা মুড়ে বাঁ হাটু উঁচু ক'রে বসে, মেজাজে তান ধরে গুলাবীবাই। তানে-গানে আকুতি জানায় কিশোরীমোহনকে। তুমি এসো, তুমি এসো ফিরে।

কিশোরীমোহনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসে বীরেন্দ্র। ওর দোষ নেই কোন। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তোকে। ভাগীদার হ'ক কেউ—চায়নি তাই।

আগেকার সন্ধ্যে ফিরে এলো। পুরবীর সুরে নয়, রঙীন প্রেমের গজল গানে। জ্বলনে কো শমাবানে···গুলাবীবাইয়ের সেই পাগল করা কিন্নরীকণ্ঠে।

শুনেছে কিশোরীমোহন। ক্ষণেকের জন্য নিজেকে হারিয়েও ফেলেছে, তবু সে মন নেই। ছুটে যায় আর একজনের কাছে কালবিলম্ব না ক'রে। সে চন্দ্রমণি।

বেশ কিছু দিন মৌন থাকার পর মুখ খুলেছে চন্দ্রমণি। বলেছে, এভাবে চোরের মতো চুরি করে আনাটা কোন বীরত্বের পরিচয় নয়, পুরুষত্বেরও নয়।

কিশোরীমোহন জানিয়েছে সমস্ত। গুলাবীবাই যা করেছে, তার অজান্তে। তার দোষ নেই। সিঙেশ্বর তলায় চন্দ্রমণিকে দেখে তার মাথাটা বিগড়েছে সত্যি। মনে হয়েছে, শিঙেশ্বরের মন্দির যেমন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করা হয়েছে—ক'শ বছরের তা কে জানে, তেমনি রত্নের খনি খুঁড়ে খুঁড়ে মহামূল্য একটি মাত্র রত্ন এখানে এনে দিয়েছেন বিধাতা স্বয়ং চন্দ্রমণিকে। চন্দ্রমণির সঙ্গে তার সঙ্গে ক'শ জন্মের জানাশোনা তা কে জানে।

আরো বলেছে, আমি বিয়ে করতেই চেয়েছি তোমায়। বীরেন্দ্র সব জানে। তার মধ্যে এই কাণ্ড ঘটে গেল।

চন্দ্রমণির বাবার কাছে বীরেন্দ্রকে পাঠিয়েছে কিশোরীমোহন।

চন্দ্রমণিকে ঘরে নিয়ে এলে সমাজের কাছে হেয় হতে হবে। সারাজীবন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে বাবা। চন্দ্রমণির বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না।

শুনে, নীরবই থেকেছে চন্দ্রমণি।

বীরেন্দ্রকে এনে আলাপ করানোর সময় বলেছে কিশোরীমোহন, এর জন্যই তুমি কালনাগিনীর হাত থেকে বেঁচে গেছো। এই বন্ধুই আমার জীবন কতবার বাঁচিয়েছে।

চন্দ্রমণি দেখল বীরেন্দ্রর আপাদমস্তক। চোখে পড়তে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটা অজানা ভয়। হঠাৎ কেন এমন হ'ল নিজেও বুঝতে পারল না। এখানে আনার জন্য কিশোরীমোহনের ওপর কি রাগ না ছিল। কিন্তু মানুষটাকে দেখে এরকম হয়নি।

কিশোরীমোহনের জন্য সব মহলেই বীরেন্দ্রর অবারিত দ্বার। যায় গুলাবীমহলে, আসে বৌরানীর মহলে। বংশের বৌদের মহল এটা। উপস্থিত চন্দ্রমণির মহল। বীরেন্দ্র এলে, ওর ছায়া দেখলেই, পরদার আড়ালে গিয়ে লুকোয় চন্দ্রমণি। পরদাটা কেঁপে ওঠে। ওখানে কে—বুঝতে আর বাকি থাকে না বীরেন্দ্রর। বলে, যত লজ্জা বৌরানীর আমাকে দেখেই! থুড়ি, 'বৌরাণী' বলে ফেলেছি। আর তাতেই বা দোষ কি—ক'দিন বাদে তো সত্যিসত্যিই বৌরানী হ'তে চলেছো। দিন-ক্ষণ-লগ্ন—সবই ঠিকঠাক। কেবল তারিখটা এগিয়ে আসার অপেক্ষা যা। নাও, বেরিয়ে এসো। অমন ক'রে পরদা চাপা দিয়ে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকতে হবে না। চলে যাচ্ছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে চন্দ্রমণি।

চমণির সঙ্গে কিশোরীমোহনের বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম ক'রে। সারা রাত গুলাবীবাই কেঁদে সারা হয়েছে। এসেছে বীরেন্দ্র। সান্ত্বনা দিয়েছে। কান্নার সময় নয় এখন। দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—যা বলেছি, তাই করে যেতে হবে সব ব্যথা বুকে চেপে রেখে। ভেঙে পড়লে চলবে না।

গুলাবীবাইয়ের কান্নাভেজা ঠোঁটে মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিহিংসার বিষমাখানো হাসি। চন্দ্রমণিকে সরাতে হবে কৌশলে। কিশোরীমোহনের হৃদয়-মহলে একাই সর্বেসবা হয়ে থাকবে গুলাবীবাই।

গুলাবীবাইয়ের নাচ গানে ছেদ নেই। চলেছে ঠিক। বিয়ে করলেও কিশোরীমোহন আসা ছাড়েনি। বীরেন্দ্র সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বীরেন্দ্র প্রতিদিন বৌরানীমহলে যায়। নতুন নয় পুরনো হয়ে আসছে, তবু চন্দ্রমণির সেই একই অভ্যেস। দেখলে সরে যাওয়া। একটু ব্যতিক্রম এই যা আগে দেখলেই মুখ গম্ভীর হয়ে যেত, এখন সেটা হয় না। একটা হাসির মুখোশ পরে। পরে কিশোরীমোহনের জন্য। একবার নয়, বহুবার বলেছে কিশোরীমোহন, তুমি একটু হাস না, কথা কও না, বীরেন্দ্র খুব মনমরা হয়ে থাকে! তুমি তো জান, সমস্তই বলেছি, ওর মতো এতবড় হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই আমাদের। সেই লোকটা তোমার কাছে অবহেলা পাক, তোমার জন্য ব্যথা পাক—আমি চাই না। ও মনমরা হয়ে থাকলে আমি সুখী হতে পারব না।

একনাগাড়ে বলার পর, একটু দম নিয়ে বলেছে, ও আমাকে দুঃখু করে বলে, তুমি ওকে ভয় পাও। ওকে ভয় পাওয়ার চেয়ে তোমার আমাকে পাওয়াই উচিত। ও দেবতুল্য। ওর সহায়তা না পেলে, এ জীবনে তোমাকে আর পেতে হ'ত না।

চন্দ্রমণির ঘরে এলে, যদিও সরে যেতে দেখে বীরেন্দ্র, কিন্তু হাসিমাখা মুখখানা খুশী করে খুব। পরিবর্তন হয়েছে। একদিন প্রতীক্ষারও শেষ হবেই।

গুলাবীবাই আর বীরেন্দ্র দু'জনেরই প্রতিক্ষার শেষ হয়ে এলো। বছর ঘুরেছে। সূর্যনারায়ণের বয়স আর কত? বয়সের মধ্যেই ধর্তব্য নয়। এক মাসের মোটে।

দিন পনেরোর জন্য কিশোরীমোহন শিকারে বেরিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে। বাড়ির সব ভার বীরেন্দ্রের ওপর।

সূর্যনারায়ণকে দেখার ছুতো ক'রে দিনে চার পাঁচবার চন্দ্রমণির

ঘরে আসতে লাগল বীরেন্দ্র। একবার ঢুকলে বেরোতে আর চায় না কিছুতেই। ছেলেকে আদর করার অছিলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। চন্দ্রমণির মন বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করে। —ঘরে যার এমন অন্নপূর্ণা তার বাইরের দিকে ঝোঁক! গুলাবীবাইকে নিয়ে মাতামাতির বহরই বা কি। বলিহারি রুচি! একটা অনুতাপ আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে বৌরানী। আমিই তো এ ঘরে আনার মূল। জেনেশুনে কি সর্বনাশই না করে ফেললুম। ভেবেছিলুম, তোমাকে পেয়ে বদ নেশাটা যাবে। মদ ছাড়বে, মেয়ে ছাড়বে। কোনটাই মিলল না। ছেলের চেয়ে তোমার চেয়ে, শিকারটাই বড় হ'ল। শিকার না ছাই। এখানে গুলাবীবাই, ওখানে শিরাজীবাই, ভেতরের ব্যাপার আমার আর জানতে বাকি নেই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে বীরেন্দ্র, অত ভালোমানুষ হলে চলবে না। একটু শক্ত হও। ওকে একটু ঘা না দিলে চেতনা জাগবে না। ও আসার আগে বরং অপর জায়গায় চল। একটু বেড়িয়েও আসা যাবে, ওকে একটু জব্দ করাও হবে। বলবো, বৌরাণী আসবে না আর তোমার স্বভাব না পাল্টালে।

অসহ্য হয়ে পড়েছে চন্দ্রমণির। দোলনা থেকে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে পড়িমরি ক'রে। ভালো লোককে রেখে গেছে। কানের কাছে রোজই ঘ্যানর ঘ্যানর। নিন্দে আর নিন্দে।

যে ভাবে বীরেন্দ্র এগিয়ে আসছে, ভয় ধরেছে চন্দ্রমণির। হাসি-কথা হাবভাব অন্য ধরনের। একটা বিপদেরই আঁচ পাচ্ছে।

আঁচ পাচ্ছিল, এখন সত্যি সত্যিই এসে পড়ল বিপদ কিশোরী-মোহন আসার ঠিক আগের দিনটিতে।

চুপ ক'রে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই আর বীরেন্দ্রর। এই এক দিনের মধ্যে যা কিছু ক'রে ফেলতে হবে। ক'দিন সুযোগ পেয়েছে। ফল লাভ হয় নি। এখন বসে থাকা উচিত হবে না মোটে।

চন্দ্রমণির ঘরে এলো।

দোলনার কাছে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমণি। ছেলের দিকে দেখল একবার বীরেন্দ্র। তারপর বলল, তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে যেতে হবে এখুনি। পাল্কি-বেহারারা সব দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রমণির বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠেছে। দোলনা থেকে ছেলে তুলে বুকে চেপে ধরেছে। বলেছে, ও আসুক। বলে যাবো। একটা দিন বাকি মাত্র। বীরেন্দ্রর চোখেমুখে আগুন ছুটেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছে, অনেকদিন অপেক্ষা করেছি আমি। একদণ্ড অপেক্ষা করবো না। সমস্ত খুলেই আমি বলছি তোমায়—এখনো যদি না কিছু বুঝে থাকো। কিশোরীমোহন তোমায় প্রকৃত ভালো-বাসে না। তোমার রূপের নেশায় ও পাগল কেবল। আমার নেশা নয়, অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছি তোমায় দেখার পর থেকে।

চন্দ্রমণির সারা শরীরে ভূমিকম্পের কাঁপুনি। মেঝেটা বড্ড বেশী কাঁপছে, পায়ের তলা থেকে সরে সরে যাচ্ছে।

হাত ধরার জন্য বীরেন্দ্র এগিয়ে আসতেই, চন্দ্রমণির কি যে হল কিছু বুঝতে পারল না। কাঁপুনি কমে গিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে শুরু করল শিরায় শিরায়। তাকাল দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকের দিকে। চালাতে জানে না। না জানলেও ভয় দেখাতে দোষ কি! বন্দুকটার কাছে সরে এলো। হাত ঠেকিয়ে বলল, ঘর থেকে বেরিয়ে যান এখুনি, বেরিয়ে যান বলছি।

এরকম রণমূর্তি দেখবে আশা করেনি বীরেন্দ্র। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেই রাতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। ঘুমোয় নি চন্দ্রমণি। উত্তেজনা রয়েছে তখনো। খানিক আগের কথা মনে পড়ছে, মাথায় রক্ত চড়ছে সঙ্গে সঙ্গে।

উৎকর্ণ হয়ে শুনছে চন্দ্রমণি। জুতোর শব্দ হচ্ছে। আবার বুঝি আসছে। বন্দুক নিয়ে তৈরী হল। চালাতে জানুক না জানুক, চেষ্টা

করবে। কিশোরীমোহনকে দেখেছে তো চালাতে—ছাতে দাঁড়িয়ে পাখি মারার সময়।

আস্তে আস্তে দরজা খুললো। অন্ধকার বারান্দা। দরজার পাশে লুকলো বন্দুক নিয়ে। এগিয়ে আসছে, আর দেরী নয়, দরজার কাছে আসার আগেই শেষ করতে হবে।

চালাল বন্দুক। আনাড়ী হাতে অব্যর্থ লক্ষ্য। অন্ধকারে আর্তনাদ ক'রে পড়ে গেল যে সে বীরেন্দ্র নয়। কিশোরীমোহন। এসে গেছে একদিন আগে! একেই বলে নিয়তি।

কিশোরীমোহনের বুকের ওপর আছড়ে এসে পড়ল চন্দ্রমণি। একি করল সে!

বীরেন্দ্র দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল দুর্ঘটনার রাত্তিরেই। চন্দ্রমণিকে বাঁচানোর জন্য। লোকে অন্তত দ্বিধার মধ্যে থাকুক। ভাবুক, বীরেন্দ্র এ কাজ করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

লোকে ভেবেছে তাই, পুলিশও ভেবেছে তাই। কিন্তু বিনা দোষে কলঙ্ক রটে গেল চন্দ্রমণির চতুর্দিকে। সেটা জোরালো হয়ে উঠল আরো চন্দ্রমণির নিজের জবানবন্দীতে। পুলিশের কাছে চন্দ্রমণি বলেছে, সে খুন করেছে, বীরেন্দ্র নয়। এতেই কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে। কে না জানে অন্দরমহলে বীরেন্দ্রর অবাধগতি। প্রণয়ীকে বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড়ে দোষ চাপাবেই তো! দু'জনে পালাচ্ছিল, কিশোরীমোহনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। কিশোরী-মোহন এসে পড়ে ধরে ফেলল, আর বীরেন্দ্র খুন করে পালায়।

এই ঘটনার পর চন্দ্রমণি আত্মঘাতী হ'তে গেছল অনেকবার। ছেলেটার মুখ চেয়ে থমকে গেছে।

সূর্যনারায়ণ বড় হয়ে সব শুনেছে। চন্দ্রমণি অকপটে বলেছে সমস্ত। ছেলের কাছে গোপন করেনি কোন কথা। মাকে নিয়ে

কাশীতে চলে যেতে চেয়েছে সূর্যনারায়ণ। রাজী হয়নি মা। বলেছে, এই ভিটেতে তোর বাবা গেছে, এই ভিটেতেই যেন আমিও যাই রে। চন্দ্রমণি মারা যাওয়ার পর সূর্যনারায়ণ কোথা গেছে কেউ জানে না।

খাতার এই পাতাটায় আর কিছু লেখা নেই। ঘটনা কে লিখেছে তার নামও নেই। জয়ন্ত গালে হাত দিয়ে বসে রইল। ভাবছে, পূর্বপুরুষ রামহরি শর্ম্মা কাশীর পথে রওনা হচ্ছে—খাতা দেখে জানতে পেরেছিল সূর্যনারায়ণ।

চন্দ্রমণির মৃত্যুর পর কাশীতেই গেছল তাই। কিন্তু সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও, রামহরি শর্ম্মা বলে যে কোনকালে কোন বৃদ্ধ ছিল—জানতে পারে নি। কোন বংশের—আদি বাড়ি কোথায় ছিল—মায়ের কাছ থেকে শোনা জয়ন্তর। ইঞ্জিনীয়ার জয়ন্ত যখন দ্বারভাঙ্গায় বদলি হয়ে আসছিল, মা বারণ করেছিল গোঁয়াতুমি ক'রে এদিকে আসতে। বাবা চান নি বলেই হয়তো।

জয়ন্ত মায়ের নিষেধ শোনে নি। বাপের অনিচ্ছাও মানে নি। নেপথ্যের একটা দুর্বার আকর্ষণ টেনে এনেছে জয়ন্তকে এই বাড়িতে।

যা জানবার জেনেছে জয়ন্ত। আর জানার কিছু বাকি নেই এ বংশের। পাতা ওল্টানোরও প্রয়োজনই বা কি। খাতাটা রাখতে যাচ্ছিল, বারণ করল বৃদ্ধ। বলল, শেষ হ'তে এখনো একটু বাকি।

পাতা ওল্টাল জয়ন্ত। হ্যাঁ, লেখা আছে।

কিশোরীমোহনের বাবা লোকনাথ আর বীরেন্দ্রর বাবা জ্যোতিপ্রকাশ দুই বন্ধু, দুই শরিক। আবার দু'জনে জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়ের বংশধরও। জায়গা-জমি নিয়ে ঘোরতর মামলা বাধল ওদের মধ্যে।

লোকনাথ বলল একদিন জ্যোতিপ্রকাশকে—মামলা জেতা মানে যার টাকার জোর বেশী। এরকম তো অনেক শোনা যায়, খালেতে দীঘিতে পাশাপাশি নৌকো ক'রে দুই শরিকে জলে টাকা ফেলতে ফেলতে গেছে। যার আগে ফুরিয়েছে, সেই হেরেছে। সব

ফয়শালা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। দশ বছর ঝুলে থেকে কি লাভ? রাজী?

রাজী হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশ।

হেরে গেছে লোকনাথের কাছে।

সকলের অলক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়াল জ্যোতিপ্রকাশ। তারপর হেরে যাওয়ার গ্লানি মুছে ফেলার জন্য, সব খোয়ানোর জ্বালা উপশমের জন্য শীতের বরফ ঠাণ্ডা দীঘির মিশমিশে জলে ডুব দিল। আর উঠল না কখনো।

মা বলেছিল বীরেন্দ্রকে, বাপের মৃত্যু ভুলো না। মামলা চললে ক্ষতি ছিল না, বাঁচতো হয়তো বহুদিন জেতার আশায়। সেটা এগিয়ে নিয়ে গেল লোকনাথ মতলব করেই। আমাদের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য। আমাদের ধনপ্রাণ গেছে। ওদেরও যেন যায়।

মায়ের কথা রাখার চেষ্টা করেছে বীরেন্দ্র। কিশোরীমোহনের সঙ্গে মৌখিক সদ্ভাব রেখে তলায় তলায় এ বংশের সর্বনাশের খাল কেটেছে। শান্তি পায়নি। তীর্থে তীর্থে ঘুরেও না। অনুশোচনার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছে। কেবলি মনে পড়েছে চন্দ্রমণির মুখ। সতীলক্ষ্মী সাক্ষাৎ দেবী। তার জন্য কি জঘন্য অপবাদ। আসল কথা জানে না কেউ। এ বংশের খাতায় লিখে রাখতে হবে। যদি কোনদিন কেউ ফিরে আসে, সত্যি জানবে।

বহু বছর বাদে ফিরে এলো বীরেন্দ্র। সূর্যনারায়ণকে দেখল আড়াল থেকে, সামনে এসে বলতে সাহস পেল না। চলে গেল দূরে আবার। আবার এলো। এবাড়ি টেনে নিয়ে এলো তাকে। তখন এখানে কেউ নেই আর। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। এবাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করল না তার। দেবীর মৃত্যু হয়েছে এখানে। এবাড়ি তার কাছে স্বর্গের চেয়েও পবিত্র। এখানে মৃত্যু হলেই তার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে। নিচে নাম সই করা। বীরেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বীরেন্দ্রর শেষে কি হ'ল? বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

দমকা কাশি এলো বৃদ্ধের। উত্তর দিতে পারল না। মাথা নিচু করল। দু'গাল বেয়ে দু'চোখের জল টস টস করে পড়ছে।

খাতার আগের পাতা ওল্টাতে লাগল জয়ন্ত। থামল। এই পাতায় লেখা সূর্যনারায়ণের নাম।

—আমি সপরিবারে কাশী চলে যাচ্ছি। এবাড়ির দীর্ঘ ইতিহাসের দীর্ঘনিশ্বাসের সীমানা থেকে আমার বংশধরকে সরিয়ে রাখতে চাই।

বাকি খালি জায়গাটুকুতে নিজের অগোচরই বুকপকেট থেকে ফাউনটেন পেন বার করে লিখতে লাগল জয়ন্ত। কে যেন হাত ধরে কি লেখাচ্ছে তাকে দিয়ে।

জয়ন্ত লিখছে, এসেছি, আসবো।

॥ তিন ॥

নীলাঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। চোখ চেয়েই অবাক। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আবীরা।

উঠে বসল। দু'চোখ রগড়ে ভালো করে দেখল আবার। স্বপ্ন নয়। সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে। বেশবাস আগের মতন। সবুজ ঘাগরা সবুজ জামা সবুজ ওড়না হ্যাজাকের আলোটা জ্বলছে পরদার আড়ালে—বাইরে। কোন জন্তু জানোয়ার ঢুকতে গিয়েও থমকাবে অন্তত। বিষাক্ত সাপের দেখা মিলেছে দু'একটা। ঘুমন্ত অবস্থায় আলোটা প্রহরী।

তাঁবুর ভেতর আলো আঁধারি।

যেটুকু দেখা যাচ্ছে, আবীরার মুখখানা গম্ভীর বিষণ্ণ। আগের সে হাসি নেই ঠোঁটের ফাঁকে, নেই চোখের তারায় তরল কৌতূকের উঁকিঝুঁকি। কেবল আছে পুরনো আহ্বান।

আবীরা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পরদার দিকে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবে। দৃষ্টি কিন্তু সরেনি। আটকে আছে নীলাঞ্জনের মুখে।

কোনদিন মুখ খুলে বেশি কথা কয়নি আবীরা। মুখে যত না বলেছে, চোখে বলেছে তত। চোখের ভাষায় এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। আবীরার দু'চোখ আকুতি অনুনয় জানাচ্ছে নীলাঞ্জনকে। বলছে, তুমি এসো, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

বেরোনোর সময় এমনভাবে তাকাল, যেন কেঁদে বলল, ওই মোহ-মাখা চোখ—এসো, এসো, এসো !

ওকে দেখে নীলাঞ্জন কেমন হয়ে গেছে। উঠতে ভুলেছে, বসতে ভুলেছে, ওকেও বলতে বসতে ভুলে গেছে। আবীরা বেরিয়ে যেতে সচেতন হয়ে উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল চার পাইয়ের ওপর।

চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করল, দাঁড়াও আবীরা ! আমি যাচ্ছি ।
পারল না ।

মাথার বালিশের তলা থেকে রিষ্টওয়াচ বার করল টেনে । রাতের শেষ প্রহর । স'চারটে । বার দু'য়েক চোখ বুললো ডায়েলের ওপর । ঠিকই দেখেছে । রাত পোহাতে দেরী নেই আর খুব বেশি । কনকনে ঠাণ্ডা বাইরে । ব্যাপারটা জড়িয়ে নিল গায়ে । বেরিয়ে পড়ল তাঁবু থেকে ।

আবীরাকে দেখতে পেল ।

বেশ খানিক তফাতে তফাতে এগিয়ে যাচ্ছে । পেছু ফিরে একবারও তাকাচ্ছে না । ও এই রকমই । আগের মনটা এখনো রয়েছে । রহস্যের আড়ালে বরাবর নিজকে আড়াল করে রেখেছে । ধরাছোঁয়ার বাইরে । কাছে এসেও কাছে আসে না । কাছে ডেকেও কাছে টেনে নেয় না । তবু এমন আকর্ষণ—না গিয়ে, ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না । পড়িমরি করে যেতে হবে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে যেতে হবে । আবীরা রহস্যময়ী মোহময়ী জেনেও ।

নীলাঞ্জন এগোচ্ছে বালির রাস্তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে । ছড়ানো টুকরো টুকরো পাথরের ওপর দিয়ে । এই রাস্তায় আগে এসেছে গেছে । আবীরার ছলছলে চাউনি নীলাঞ্জনের বুকের ভেতর কি যে তোলপাড় করত –বলে বোঝানো যায় না কাউকে । কি ধরনের যাতনা, নিজেও কিচ্ছু বুঝতে পারত না ।

সেবারেও জালোর পাহাড়ের কাছ বরাবর তাঁবু ফেলেছিল নীলাঞ্জন !

বকফুল রঙা সাদা ঢেউ খেলানো তাঁবুটা একটু দূর থেকে, ছোট্ট শ্বেতপাথরের পাহাড় বলে ভুল হ'ত । রোজ সাতসকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসত নীলাঞ্জন । জালোর পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়াত । চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত জায়গাটা । কোথায় খুঁড়লে কি পাওয়া যেতে পারে । একটা আন্দাজ করে নিত মনে মনে । আন্দাজটা অনেক সময় ফলেও গেছে । মাটির তলা থেকে রাজারাজড়াদের পাথরের খোদাই ইতিহাসও পেয়ে গেছে ।

এতে আত্মবিশ্বাস এসেছে দারুণ। কেউ যদি বলে, এমনি দু'একটা হয়েছে বলে কি সবই হবে? তখুনি উত্তর দিয়েছে। সবই হবে। আমার মনের চোখে দেখি আমি। ত্রিনয়ন কি সকলের থাকে নাকি।

এই ত্রিনয়নে দেখত বালি-পাথর জমির ভেতরটা, তখনই একদিন চোখ পড়ল আবীরার ওপর।

পাহাড়ের গায়ে সনচরী-যাদুকরীর নামের স্মৃতিফলক আঁটা যেখানে, সেই জায়গাটায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে হাঁটু মুড়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় বসে আছে আবীরা। যেন পাহাড় কুঁদে পাহাড়ের গায়েরই মূর্তি ও। দেবী প্রতিমা।

দেখে নীলাঞ্জন তন্ময় হয়ে গেছে।

তন্ময়তার ঘোর কতক্ষণ ছিল, জানে না। মূর্তি নড়ে উঠতে ঘোর কেটেছে। আবীরা উঠে দাঁড়াল। মিঠে সোনালী রোদ আছড়ে এসে পড়ছে ওর মুখে, ওর সর্বাঙ্গে। মায়াবী দু'চোখ হাসছে। দৃষ্টি নীলাঞ্জনের মুখের উপর। হাওয়ায় ফিনফিনে পাতলা সবুজ ওড়নাটা উড়ছে। চুমকিতে রাতের নক্ষত্র দিনে ধরা পড়েছে। চিকমিক করছে।

পায়ের মলের ঝমঝম আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে আবীরা। এলো। নীলাঞ্জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, পায়ে চটি।

মুচকি হাসল। মুখে রোদ লাগছে। কপাল কুঁচকে ওড়নাটা ঢেকে নিল। বাতাসে গোলাপী আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নিশ্বাস টেনে নিল বুক ভরে নীলাঞ্জন। মায়াবী চোখের ইশারায় সঙ্গে যেতে বলল আবীরা।

অচেনা অজানা তরুণী। বেশভূষায় রাজস্থানের আভিজাত্য মাখানো। চেহারায় মনে হয় আমীর ঘরের দুলালী। শুধু দুলালীই নয়—রীতিমতো রূপসী। সঙ্গে যেতে ইতস্ততঃ করছে। যাবে কি যাবে না।

আয়ো মেরে সাথ—হাসতে হাসতে বলল আবীরা। গলায় কোন

কুণ্ঠা সঙ্কোচ নেই। সহজ সরল।—আমার সঙ্গে যেতে কি ভয় করছে? কোন ভয় নেই। আসুন। বিশেষ দরকার আছে বলে ডাকছি।

নীলাঞ্জন বিস্মিত।

গোড়ায় রাজস্থানীতে বলল, আবার পরিষ্কার বাঙলা। পরিচয় জিজ্ঞেস করার মুখে নীলাঞ্জন থমকাল। মেয়েটি যেন তার মন। যা ভাবছে সে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছে। আবীরা বলল, আমি কে পরে জানতে পারবেন। বেশি দূর নয়, খুব কাছেই বাড়ি।

কথারও আকর্ষণ ফেলা যায় না। নীলাঞ্জন অনুসরণ করতে শুরু করল। আবীরা এগোচ্ছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। ভুরুর ওপর হাত দিয়ে দেখছে পেছু ফিরে। মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলছে।

নীলাঞ্জন যন্ত্রমুগ্ধের মতন চলেছে পা চালিয়ে। আবীরা যেন তার চেনা, খুব চেনা। কোথায় যেন কখন দেখেছে দেখেছে মনে হয়। মনে পড়েও পড়ছে না। একটা বোবা আকুলি-বিকুলি তার অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছে।

চলছে চলছে চলছে।

একটা চারমহলা বেলেপাথরের তিনতলা বাড়ির সামনে এসে আবীরা দাঁড়াল। নীলাঞ্জন পেছনে।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটি পৌঢ়। কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফে মুখ ভর্তি। ঋজু দেহ। রুক্ষ চেহারা, রুক্ষ মেজাজ, রুক্ষ ভাষা। দেশের ভাষায় বলল, আচ্ছাই মেয়ে তো তুই। তোর মাকে জানিস নে নাকি? ঘরবার করছে সেই থেকে, আর আমায় জ্বালাচ্ছে।—আবীরের আমার এত দেরী হয় না তো কখ্খনো। চুপ করে বসে আছো কেমন করে? বাইরে বেরিয়ে ত্থাখো একবার।

আবীরার পেছনে কে দাঁড়িয়ে না দাঁড়িয়ে ভ্রুক্ষেপ করল না কোন প্রৌঢ়। চিবুক ধরে আদর করে বলল, বেটি এত দেরী করিসনে

আর। ছেলে মেয়ে নিয়ে যে মা বাবার কত ভাবনা তুই বুঝবি কেমন করে বল? খানদানি ঘরের মেয়েকে কত আগলে রাখতে হয়। এমনিতেই তো বিনা ছুতোয় গায়ে কালি ছিটোতে কসুর করে না জ্ঞাতি দুশমনরা।

আবীরার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে নিয়ে গেল ভেতরে। আবীরাও নীলাঞ্জনের দিকে তাকাল না একবারের জন্য। ডেকে নিয়ে এসে এমন অভদ্র আচরণ মানুষ যে মানুষের সঙ্গে করতে পারে তা ধারণার অতীত।

ফিরে এলো তাঁবুতে নীলাঞ্জন।

ঠাকুর্দার কথা কানে বাজছে। দাদাভাই, মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিনই তার শিক্ষা হবে। এ একরকমের শিক্ষা! হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। হতে পারে ওরা রাজারাজড়া, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার সম্মানও কম নয়। অতীতকে মাটির বুক থেকে বার করে বর্তমানের চোখের সামনে তুলে ধরে সে। সে আর্কিওলজিস্ট। তার কাজ সাধকের সাধনার। যে দেশেই গেছে, সেই দেশের মেয়েছেলে আশ্রয় দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে। এখানে এসেই যৎপরনাস্তি অপদস্ত হল।

অপদস্ত হলেও আবীরা এসে মুখ বাড়াচ্ছে খালি মনের দরজায়। আবীরাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেও পারছে না। মেয়েটি মোহিনী মায়া জানে নিশ্চয়। মানুষ ভুলিয়ে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা।

রাতভোর ঘুমোতে পারেনি ভালো করে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙেছে। আবীরার কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট করেছে। নিজেকে সংযত করে রাখতে প্রবল বেগ পেতে হয়েছে। মাটির তলা খুঁড়ে জিনিস বার করে যে, সে নিজের মনের তলা খুঁড়ে কিছুই পাচ্ছে না। কেন এমন হচ্ছে?

সকাল হতেই নিজের কাজে মন দিল। পাহাড়ে উঠবো-উঠবো

ভাবছে, দেখলো—আবীরা। আগের দিনের সেই জায়গায়, সনচরী যাত্নকরীর ফলকে মাথা ঠেকিয়ে বসে। গভীর ধ্যানে মগ্ন। কখন এসেছে কে জানে। রাত না পোহাতেই হয়তো বা।

গতকাল যা করেছে, এর মুখনা দেখাই উচিত তার। চোখ খুলে দেখলে বিপত্তি ঘটতে পারে যে কোন। যেটুকু জেনেছে যা জেনেছে —খুব অল্প সময়ের হলেও মনে হয়—এর কুলুজিতে অসাধ্য বলে কোন শব্দ লেখা নেই। সমস্তই সম্ভব। চোখ না খুলতেই সটকান দিতে হবে এখান থেকে।

নীলাঞ্জন মনের চোখে দেখতে পায় বলে চোখ বুজেও মানুষ দেখে, এ জ্ঞান ছিল না। হ'ল। পা বাড়াতে যাচ্ছে সবে, অতি সন্তর্পণে —আবীরা তাকাল। ফিক করে হাসল। মিঠে গলায় বলল, কালকের ব্যাপারটায় আমার যে কি লজ্জা সে আর কি বলবো আপনাকে। কোথায় মায়ের সঙ্গে আলাপ করাব, তা আর হল না। বাবা মা হু'জনেই আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে। দিন সাতেক এসেছেন আপনি, ওরা সমস্ত খবর জানে। আমি এখানে রোজ আসি। তাই আমাকে এ কাজের ভার দিয়েছিল। বাবা এমনিতে লোক খারাপ নয়। মা আমাকে না দেখতে পেলে পাগল হয়ে ওঠে। বাবার তখন মাথার ঠিক থাকে না। মাথায় রক্ত চড়ে, যাকে তাকে যা-তা বলে বসে। গিয়ে যা দেখলুম, পরিচয় করাইনি আর।

নীলাঞ্জনের মুখে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল আবীরা। ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিতে পেরেছে কিনা। অপমানের জ্বালাটা ঠাণ্ডা হয়েছে কি না। দেখল তরুনটি শিবের চরিত্র। ভোলানাথ। হাসছে। পালাতে গিয়েও দাঁড়িয়ে কথা শুনল। শুনতে শুনতে একদম চঞ্চল হয়ে ওঠেনি।

ভরসা এলো দ্বিগুণ। আবীরা বলল, দেখুন আজকের দিনটি দয়া করে চলুন। একটু শিগ্‌গির অবিশ্যি। মাথায় ওড়নাটা সামনের দিকে টেনে দিয়ে হেসে ফেলল। শিগ্‌গির বলছি এই কারণে, মাথায়

রক্ত চড়তে পারে দেরী হলে। কালকের দশা হলে, লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে আর কোন দিন কি সঙ্গে যেতে বলতে পারবো? আর বলতে যদিও বা পারি, আপনিই কি শুনবেন তখন? আসুন।

এমন সোজাসুজি কথার পর দ্বিধা দ্বন্দ্বের কোন বালাই থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। আবীরার সঙ্গে যাচ্ছে নীলাঞ্জন। আগুপিছু নয়, পাশাপাশি। পরিচয় জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলেও, করছে না। আবীরা বলেছে, পরে জানতে পারবেন।

বাড়ির সামনে এলো দু' জনে।

অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে দু হাত বাড়িয়ে মাথা নুইয়ে হাসি মুখে ভেতরে নিয়ে যেতে লাগল আবীরা। আবীরার মুখে চোখে খুশির ঢল নেমেছে। চাতাল দিয়ে যাচ্ছে। বহু পুরোনো দিনের বাড়ি। যেতে যেতে নজর পড়ল পাথরের দেয়ালে বড় বড় হরফে খোদাই করা লেখাটার দিকে। দাঁড়াল নীলাঞ্জন। কনোড় রাজের বাড়ি। প্রায় ছ'শো বছর আগে এই বাড়িতে মহারাজ মেবারের রাণাকে নেমতন্ন করে এনে বন্দী করে রেখেছিলেন। নিজের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন রাণার সঙ্গে। চৌহান রাজপুতদের মধ্যে বিধবা বিয়ে প্রথম চালু করে গেলেন মহারাজ। নাত্‌রায়ত বিয়ে।

এদেশের মাটির তলায় অতীত গুমরে গুমরে কাঁদছে. মাটির ওপর কান্নাভেজা দীর্ঘশ্বাস পড়ছে তার। কেউ দেখে না, কেউ খবর রাখে না। যে যা চায় তাই যেন তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় সেই জায়গায়। অদ্ভুত ভাবে নিয়ে এসেছে নীলাঞ্জনকে। আবীরা উপলক্ষ্য মাত্র। এখানে মহালাভ হল একটা নীলাঞ্জনের।

পকেট থেকে নোট বুক বার করে লিখে নিল কথা ক'টা। ওড়নার ভেতর থেকে আড়চোখে দেখল আবীরা। ঠোঁটের কোনে বাঁকা হাসি।

ভেতরটা বড় নিস্তব্ধ লাগছে। দুজনের নিশ্বাস পড়াটাও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আবীরার পায়ের মলের ঝমঝম আওয়াজটা জোর জোর শোনাচ্ছে।

এমনভাবে ঠমকে ঠমকে চলেছে আবীরা যে, ওর মলের আওয়াজে নাচের তাল বেজে উঠেছে। নীলাঞ্জনের মনে হচ্ছে একজন নাচছে না। অনেকে একসঙ্গে নাচছে। বিচিত্র অনুভূতি।

চাতালের ভেতর দিয়েই খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। উঁচু ধাপ। দু'পাশে উঁচু রেলিং নেই। দেয়াল। লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির ধাপে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগল আবীরা। এবারে পাশাপাশি নয়। নীলাঞ্জন পেছু পেছু উঠছে।

দোতলায় এলো।

বারান্দা। ঝাড়লণ্ঠন ঝোলান। পামগাছের পেতলের টব সাজানো সারি সারি। মাঝখানে একটা চারপাই। নীল মখমলের চাদর বিছানো। আবীরার মা বসে আছে। মোটাসোটা বেঁটেখাটো মানুষ। হাসি হাসি মুখ। চাঁপা রঙের সাজসজ্জা। যতদূর সম্ভব গলা মোলায়েম করে বলল, বেটা বোসো! তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে অনেক। দাঁড়িয়ে কেন? বোসো আগে। এ তোমার নিজের বাড়ি জানবে। আমিও তোমার একজন মা বাবা!

বসল নীলাঞ্জন। কি স্নেহ উজাড় করা কথা। মায়ের কথা মনে পড়ছে। বেরোনর সময় মাকে প্রণাম করতে পায়ে হাত ঠেকিয়েছে, হাতটা ধরে তুলল মা। জলে ভরে উঠেছে দুচোখ। ধরা গলায় থেমে থেমে বলল, বাইরে সাবধানে থেকো। ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।

নীলাঞ্জন মন খারাপ করবে বলে মায়ের জলভরা চোখে হাসি ফুটে উঠল। হাতের আঙুল চিবুকে ছুঁইয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল একবার।

মায়েদের কোন পৃথক জাত নেই। পৃথিবীর সব দেশের মা-ই এক জাতের। আবীরার মায়ের মুখে নিজের মায়ের মুখই দেখছে যেন নীলাঞ্জন।

আবীরা দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। লজ্জায় মুখ রাঙা। চোখ ফিরল রোশনীর! বলল, আবীরা বেটি, বোস তুই। তুই না

বসলে চলে? তোর কথাই তো বলবো বলে ডেকেছি ওকে। বোস বেটি। হাত ধরে টেনে বসাল আবীরাকে পাশে।

রোশনী বলল, হ্যাঁ বাবা। এবার আসল কথায় আসা যাক। সনচরী-যাদুকরীর যাদুর খেলা জানার জন্য মেয়ে আমার পাগল। সোনিয়া বংশের মহারাজ নাকি সেসব পাথরে খোদাই করে মাটির তলায় পুঁতে রেখে গেছেন কোথায়। লোকের মুখে শুনে ওর নাওয়া খাওয়া গেছে। আচ্ছা এ কেমন মেয়ে বলতো বাবা? লোকে কি সব ঠিকঠাক বলে? তুমিই বল না? এ নিয়ে এত মাতামাতির কি আছে!

—লোকে যা বলে, তার কিছুটাও তো সত্যি। লোকের কথা নিয়েই আমরা অনেক জিনিস পেয়েছি, পাই।

—ভালো ছেলে যা হ'ক তুমি। কি বললুম, কি বুঝলে? তোমার কথা শুনে মেয়ে তো আরও ক্ষেপবে। আমায় আর তিষ্ঠতে দেবে না ঘরে। এ হল কি জান, নোটেকে বলনা নোটো, উল্টে ধরবে চুলের মুঠো। যাক্, আমার আর বলার কিছু নেই। মেয়েকে সামলাও তুমি। সনচরীর যাদু খেলার নিয়মকানুন মাটি খুঁড়ে খুড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বার কর এবার দেখোনা মেয়ে আর ছাড়ছে না তোমায়। ও কেমন ছিনেজোঁক টেরটি পাবে'খন।

হাসল নীলাঞ্জন। তাতে কি হয়েছে। আমাদের তো কাজই এই। বরং আমার লাভই হবে। সনচরী-যাদুকরীর জিনিসটা আমিও জানতে পারব। দেশকে পুরনো হলেও নতুন আলো দেখাতে পারবো একটা। সনচরীর ব্যাপার ক'টা লোকেই বা জানে? কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ইতিহাসের পাতা থেকে।

হো হো করে ভাঙাগলায় হেসে উঠল প্রৌঢ়। আবীরার বাবা—খরশুন। ঘরের মধ্যে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ শুনছিল সমস্ত। বেরিয়ে এলো। নীলাঞ্জনের হাতে হাত দিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিল জোরে। বলল, বেটা তুমি যা যা বলেছো ঠিক। আবীরা বেটিকে দেখো একটু। বেটি, মেহমানকে মহলের বাইরে দরজা অবধি পৌছে দিয়ে আয়।

—থামো দিকিনি। অত গাঁক গাঁক করে চিৎকার করতে হবে না। তুমি ঘরে যাও তো। ওমা, আমি আনলুম, বোঝালুম মুখের ফেনা তুলে, আর উনি নাম কেনার জন্য ফোঁপর দালালি করতে এলেন কোত্থেকে।

স্ত্রীর গঞ্জনায় চুপ হয়ে গেছে খরশুন।

আবীরা মুখে ওড়না গুঁজে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। সারা শরীর চাপাহাসির ধমকে দুলে দুলে উঠছে।

পরিবেশটা বড় ভালো লাগছে নীলাঞ্জনের। একেবারে ঘরোয়া। হাসি বকুনি সবের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ আনন্দ আর মমতার স্রোত বয়ে চলেছে। এরা ভাবেনি নীলাঞ্জনকে বাইরের লোক। নীলাঞ্জনও ভাবতে পারছে না, সে বাইরের ছেলে।

রোশনী চোখ পাকিয়ে তাকাল একবার খরশুনের দিকে। দাড়িগোঁফ চাপা হাসি দেখে ফেলার ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল পেছনে খরশুন। এত রসে ভরা মানুষটাকে কি 'রুক্ষই না দেখিয়েছিল কাল। এমনি দেখে অনেক সময় ভুল হয়। মেলামেশা না করলে টপ করে বোঝা যায় না কাউকে।

সপ্তমের চড়া স্বরকে খাদে নামিয়ে নিয়ে এলো আবার রোশনী। বলল, বেটা কিছু মিষ্টি মুখ করে যাও।

—না, আজ নয়। দেরী হয়ে গেছে। অন্য একদিন খাবো এসে। কথা দিচ্ছি।

—আসবে কিন্তু। দুপুরের খাওয়া খেতে হবে এখানে, বলে দিলুম। কোন কথা শুনবে না আর সেদিন তোমার এ মা।

রোশনি বসে বসে চীৎকার ক'রে ডেকে উঠল— মাধোলাল মাধোলাল।

একথালা মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির করল মাধোলাল। আগে থেকে ব্যবস্থা করা ছিল নিশ্চয়, রোশনীর ডাকের ধরনে বুঝে নিয়েছে মাধোলাল। শ্বেতপাথরের রেকাবিটা রাখল চারপাইয়ের ওপর—নীলাঞ্জনের সামনে।

নীলাঞ্জন খাবে না কিছুতেই, রোশনীও ছাড়বেনা। অন্তত একটাও

খেতে হবে। শেষে রোশনী নিজে হাতে করে একটা মেঠাই থালা থেকে তুলে নিয়ে জোর করে নীলাঞ্জনের মুখে গুঁজে দিল।

রোশনীর ইঙ্গিতে আবীরা সঙ্গে নিয়ে চলল নীলাঞ্জনকে। চার মহলার বাইরে পৌছে দেয়ার আদেশ।

সঙ্গে যেতে যেতে নীলাঞ্জন কৌতূহল চাপতে পারেনি। বলেছে, কিছু মনে যদি না করেন—একটা কথা বলবো ?

স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে। আমি রাজকুমারী নই। আমার মা বাবা রাজা-রাণী নয়। রাজকুমার মেহেরবানি করে বাড়িটায় থাকতে দিয়েছে আমাদের।

—কই দেখলুম না তো রাজকুমারকে ?

মাঝেমধ্যে আসে। রাজকুমারের আসার সময় হয়ে এসেছে। এলে, মাস তিনচার থাকে। রাজকুমার এলে, বাড়ির এই দশা থাকবে নাকি ? চারিদিকে সেপাই সান্ত্রীর পাহারা। বাড়ি তখন গমগমে হয়ে উঠবে লোকজনে। রমরমে হয়ে উঠবে নাচগানে আনন্দে।

—এই অভাজনের বোধ হয় তখন প্রবেশ নিষেধ ?

—এক রকম তাই ! তবে রাজকুমারকে বলে কয়ে আমি আপনাকে আনাবো। সে পরের কথা পরে। আপাতত আমার কাজটা সেরে ফেলুন তাড়াতাড়ি। তা নাহলে নিস্তার নেই আপনার।

—হ্যাঁ, আপনার কাজের কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম। মাঝে অন্য কথা এসে পড়ল।

—অপ্রাসঙ্গিক কিছু কি এসে পড়েছে ? ওসব জানারও আগ্রহ আপনার প্রবল। বুঝেসুঝেই জানিয়েছি। হ্যাঁ, বলুন এবার আপনার কথা।

—আচ্ছা, সনচরী আপনাকে এমন পেয়ে বসল কেন ?

আবীরার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজবংশের পরিচয় যে দেয়ালে লেখা, সেই দেয়ালের দিকে তাকাল একবার। একটা নিশ্বাস পড়ল জোরে।

ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠল। ব্যথা ঝরে পড়ল কথায়।—বড় করুণ কাহিনী সনচরীর। সেইটাই আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। এই অবধি বলে চুপ করে রইল।

নীলাঞ্জন বলল, থাক। আপনাকে বলতে হবে না কিচ্ছু। না জেনে-শুনে, প্রশ্ন করে, আপনার ব্যথার জায়গায়ই আঘাত করে বসলুম। ক্ষমা করবেন।

আবীরা সচেতন হয়ে উঠল। বলল, না, না। ওর কথা মনে পড়লে, আমি কি রকম হয়ে যাই। সোনিয়া বংশের রাজা ভালোবেসেছিল সনচরীকে। সনচরীর দড়ির খেলা দেখে মোহিত হয়ে যেত। রাজ্যপাট সব ভুলে যেত। দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে যেত যখন সনচরী, মনে হ'ত বুঝি শূন্যে পা ফেলে নাচছে। বাতাসে ভেসে ভেসে চলেছে এ-পাহাড়ের চুড়ো থেকে ও পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত।

বলতে বলতে আবীরার গলা ধরে এলো। চোখের কোণ চিকচিক করছে। একটু থেমে, ফিসফিস করে, বলল, এত সূক্ষ্ম শিল্প, এত সুন্দর জীবন—কত লোককে আনন্দ দিয়েছে—কত দিনের কত কষ্টের সাধনা—সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। কুটিল চোখ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মানুষখেকো। সনচরীর মৃত্যু না দেখে তৃপ্তি পাবে না, শান্তি পাবে না। কার কুটিল চোখ? মহারাজের মন্ত্রীর। অপরাধ? আবেগে মহারাজ বলে ফেলেছিলেন, সনচরীর পুরস্কার অর্ধেক রাজ্য।

দু'চোখ উপচে টসটস ক'রে জল পড়ছে আবীরার। আবীরা বলছে, আমি ওর মৃত্যু চিন্তা করলে চাক্ষুষ দেখি যেন। ওর মৃত্যুর সঙ্গে আমার ও মৃত্যু হয় যেন। মুহূর্তের জন্য হলেও, অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করি আমি।

ব্যথা-কান্নার জায়গাটা বোধহয় সকলের একসুরে বাঁধা। একই অনুভূতির সুরে। অবিশ্যি যাদের অনুভূতি বলে, কোন বস্তু আছে ভেতরে। নীলাঞ্জনের চোখের পাতা ভিজে উঠছে। বলল, থামুন। আর শুনতে চাইনে।

আবীরা বোধহয় শুনতে পেল না। বলছে, বিশ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় টান করে দড়ি বাঁধা। চতুর্দিকে দড়ির ওপর ঘাগরা দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচবে সনচরী-যাদুকরী। সনচরী নাচছে, দেখছে ঘোরা-ফেরা করতে। মহারাজা তন্ময়। মাঝ-বরাবর এসেছে সনচরী, আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। মন্ত্রীর ইশারায় দড়ি কেটে দেয়া হ'ল সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। শূন্য থেকে আছড়ে পড়ল সনচরী পাথর জমির ওপর। তারপর সব শেষ।

ওড়নার খুঁটে চোখ মুছল আবীরা।

দরজার কাছে এসে জোড়হাতে বলল—নমস্তে। তখনো আবীরার চোখের জল শুকোয়নি। তবু হাসল। তার বেদনা মেহমান সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যাবে কেন?

'কেন'র কি নিষ্পত্তি হয়েছে কোনকালে? আবীরার ম্লানমুখের হাসি আরো কাতর ক'রে তুলল নীলাঞ্জনকে। আবীরার মতন সে-ও হাসতে চেষ্টা করল। পারল না। অবসাদ ভরা মন নিয়ে বিদায় নিল নীলাঞ্জন। যেতে যেতে পিছু ফিরছে, দেখছে বিষাদের প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে একখানা। হাসিমুখে হাত নেড়ে চলেছে একনাগাড়ে। যতদূর দেখা যায়—দেখেছে এ দৃশ্য।

ঘুম তো দূরের কথা, তন্দ্রাই আসছে না। চারপাইয়ে স্থির হয়ে আবীরা শুতে পারছে না। একবার উঠছে একবার বসছে। একবার বারান্দায় বেরিয়ে নিচের রাস্তাটা দেখছে। হাত বাড়িয়ে শমীগাছের ডালে হাত দিচ্ছে। আবার ফিরে আসছে ঘরে। কি যে হচ্ছে, কোন কিছু বুঝতে পারছে না। নীলাঞ্জনের মুখ দেখলে মায়া হয়। আবীরা যেন কতদিন ওকে দেখছে। কি সুন্দর নাম। এ নাম কি ভোলার? মনের আয়নায় জ্বলজ্বল ক'রে ঘোরা-ফেরা করছে। একি সে?

কোথা বাড়ি জিজ্ঞেস করতে মুখে বেধেছে। পরিচয়ও। ও-ও

তো তাকে চিনতে পারছে না। এক নামের বহু মানুষও তো থাকে? চেনার চিহ্ন আছে। কিন্তু পোষাকে ঢাকা সারা শরীর। এক দিনের আলাপে কি কোন ছলছুতোয় কারো দেহের কোনো অংশ দেখা সম্ভব? সম্ভব হ'ত ঘনিষ্ঠ হ'লে। যে যুবকের চোখে যে স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ অপরিচিত—তার পক্ষে নয়।

যখুনি বসছে, বা শুচ্ছে, তখুনি চিন্তাটা ঘোরাল হয়ে উঠছে আরো। আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরছে অতীত। দুঃস্বপ্নের চাবুক বসিয়ে দিচ্ছে পিঠে সপাং সপাং করে। জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে পিঠের সঙ্গে বুকটাও। মাথাও।

ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে জালা থেকে পেতলের মগে ক'রে ঠাণ্ডা জল তুলে তুলে মাথায় ঢালতে লাগল। ঠাণ্ডা হচ্ছে না একটুও। গরম হয়ে উঠেছে আরো। মাথায় হাত দিয়ে দেখল, ব্রহ্মতালু আগুন।

ওপাশের ঘরে রোশনী। ঘরের আলো নেভানো। জানলা দিয়ে দেখছে সব। প্রাণের পুতলীকে দিনেই কাছ-ছাড়া করতে চায় না। একদণ্ড, রাতের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাছে নিয়ে শোয়।

আবীরা বলেছে, আজ একটু একলা শুতে দাও আমায়। শরীর ভালো নয়। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। ঘাড় থেকে খসে পড়বে বুঝি। একা ঘুমোতে দাও একটু।

রোশনী বলেছে—একা আরো কষ্ট হবে। আমি একটু টিপে দি না-হয়।

—না। তোমার আবার কষ্ট হবে। ওই জন্যই তো ওঘরে আমি শুতে চাইছি।

—মানুষ ক'রে এত বড়টা ক'রে তুললুম-আর এখন কষ্ট হবে-বলিস কি রে। কত রাত ঘুমোইনি, কতদিন খাইনি তোর অসুখ-বিসুখে

—এতদিন করেছ বলে, সারা জীবন ধরে করতে হবে নাকি বিবেক-বুদ্ধির মাথা খেয়েছি নাকি আমি? আমিও ঘরে যাচ্ছি। দরকার

হ'লে ডাকবো; পারি তো আসবো। সামনা-সামনি ঘর। এদিক আর ওদিক। তোমার কোন ভাবনা নেই।

ভাবনা নেই বলে আবীরা চলে গেলেই কি রোশনীর ভাবনা ছাড়ে। রাত গড়িয়ে মাঝরাতের দিকে এগুচ্ছে। মেয়ে পাশে নেই, চোখের পাতা এক করতে পারেনি রোশনী। ডাকল, এঘরে আসবি আবীরা ?

—না।

—যাবো আমি ?

—না।

ভেতরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল আবীরা। একা একা কাঁদারও যো নেই। শুধু পাহারা। আর পাহারা। মুক্তি কি পাবে না কোনদিন সে ?

দুম দুম করে দরজায় ঘুষি পড়তে লাগল। রোশনী এসেছে। থাকতে পারেনি। চিৎকার করে গোটা বাড়িটার ঘুম ভাঙাচ্ছে। ও মা আবীরা, ও আমার আদুরী। খোল মা খোল।

বিরক্ত হয়ে আবীরা দরজা খুলল।

রোশনী ঢুকেই বারান্দায় গেল। অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে শমীগাছের তলাটা দেখল। রোশনী কি দেখছে, কেন দেখছে, জানতে আর বাকি নেই আবীরার। বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। তা না হলে রোশনীর হাত থেকে রেহাই নেই। কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে সমস্ত রাত্তির।

আবীরার রাত কাটল, না ঘুমিয়েই।

ভোরে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাকল রোশনী—আবীরা বেটী। ওঠ, তোকে তো আবার যেতে হবে পাহাড়ে। আমার নতুন ছেলের কাছে। আসে যদি নিয়ে আসিস না। বড় ভালো লেগেছে।

আবীরা কোন কথা কইল না। শুধু রোশনীর চোখে চোখ রেখে

কি দেখল যেন। রোশনী হাসল। আবীরাও মুখ টিপে হাসছে চিবুক ধরে আদর করল রোশনী। বেটীর আমার কি বুদ্ধিই না হয়েছে। হাঁ করলে, কথা বুঝে ফেলে। বেঁচে থাক মা। তোর মুখ চেয়েই আমার বেঁচে থাকা।

রাতের নীল জামা-ঘাগরা ছেড়েছে আবীরা। দিনের সবুজ ঘাগরা জামা পরেছে। সবুজ ওড়নায় গোলাপী আতর ছিটিয়ে দিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তো বসানো সিঁথি সিঁথের ওপর—মাথার চারপাশে ত্বহাতে করে চেপে চেপে বসিয়ে দিয়েছে। চোখে আর একটু কাজল বুলিয়েছে।

ওড়নাটা তুলে মাথায় দিল। গলায় মুক্তোর মালা ও হাতে মুক্তোর বালা। কানে তিন থাক মুক্তোর ঝুমকো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার আয়নায়।

রোশনীর দিকে তাকিয়ে ওড়নাটা টেনে দিল মুখ অবধি।

আনন্দে বলে উঠল রোশনী, ঠিক হয়েছে বেটি। যেমনটি শিখিয়েছি ঠিক তেমনি।

আবীরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মলের ঝমঝম আওয়াজ শুনছে রোশনী। সিঁড়ি দিয়ে নামছে আবীরা, মহল পেরিয়ে যাচ্ছে। রোশনীর কাছে এসে দাঁড়াল মাধোলাল। রোশনীর দৃষ্টি ঘুরল এপাশ থেকে ওপাশে। সিঁড়ি থেকে নিচের আঙিনায়, তারপর সড়কে।

দেখল মাধোলাল। পা টিপে টিপে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। যাচ্ছে। আঙিনা, রাস্তা···

সনচরীব ফলকের কাছে অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে নীলাঞ্জন। মলের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। এত আস্তে চলে আবীরা, যে বসে থেকে থেকে আর পারা যায় না।

ছুটে গিয়ে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। মনে লজ্জাভয়। কি ভাববে আবীরা? অন্য কাজ ফেলে রেখে সনচরীর ব্যাপারটাই সবার আগে। আবীরাকে নিশ্চিন্ত করতে না পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না সেও।

এলো আবীরা। বসল সনচরীর ফলকের নিচে। আজ আর ধ্যান করল না। নীলাঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, ধ্যান ক'রে আর কি হবে বলুন? যে জন্য করতুম সে ফল তো হাতে হাতেই পেয়ে গেছি। বলতুম, তোমার জিনিস কি ক'রে উদ্ধার হয়—তুমিই ব্যবস্থা কর। তোমার কাজ তুমি ছাড়া আর কে করবে? তা, সনচরী স্বকর্ণে শুনেছে। আপনাকে টেনে এনেছে, আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগও করে দিয়েছে। আর ভাবনা কি বলুন। কথায় বলে—

কাজের বেলা কাজী,
কাজ ফুরুলে পাজী।

খিল খিল করে হেসে উঠল আবীরা।

নীলাঞ্জনও ছেলেমানুষের মতন হাসছে।

আবীরা অবাক হয়ে দেখছে, এ হাসি যে তার খুব চেনা। ডুকরে কেঁদে উঠছে ভেতরটা। কি করবে আবীরা—কোথায় যাবে।

বাতাসে যেন কার নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনছে। কে যেন চতুর্দিকে ঘুরছে তার। এত বাতাস, তবু দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথার মধ্যে আবার অসহ্য যন্ত্রণা। বুকে দমাদম হাতুড়ি পিটছে। বসে থাকতে পারছে না, উঠে পড়ল। বাড়ি যাবে। নীলাঞ্জনের কাছ থেকে পালাবে। ওর চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় সে।

নীলাঞ্জনের হাসিথেমেছে কখন, ওর চোখে আবীরাকে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে।

শিকারীর তীর বেঁধার ভয়ে হরিণীর মতন চঞ্চল হয়ে উঠেছে আবীরা।

আবীরা বলল, আমি যদি না আসি, ভাববেন না। দাঁড়াল না আর একতিল।

আবীরার আচরণে নীলাঞ্জন শুধুই স্তম্ভিত নয় হতবাকও। এত আগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া সনচরীর স্মৃতি উদ্ধারের ভার দেয়া— হঠাৎ এমন পরিবর্তন। বাড়ির ইচ্ছে নয় হয়তো এভাবে আসা যাওয়া করে। কিন্তু বাপ-মাই তো পাঠিয়েছিল।

নীলাঞ্জনের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ভেবে কোন কুল কিনারা পাচ্ছে না।

চলে গেল তাঁবুর ভেতর।

সারা দিন মন বসাতে পারল না কোনো কাজে।

প্রবল বিস্ময়ের ধাক্কা খেল নীলাঞ্জন রাত্রিতে।

আশ্বিনী পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছে পাহাড় জমি গাছ গাছালি। খানিক আগে বাইরে বেরিয়েছিল একবার নীলাঞ্জন। দেখে দুচোখ জুড়িয়ে গেছে। তাঁবুর ভেতর ঢুকত না, ঢুকল আবীরার মুখ ভেসে উঠতে। মনের ভুলই সেটা। সনচরীর স্মৃতি-ফলকের নীচে বসে।

অপরূপ দেখাচ্ছিল। জ্যোৎস্না জমে জমে গড়ে উঠেছে যেন আবীরা। আবীরা রক্তমাংসের স্ত্রীলোক নয়।

কল্পনার রাজ্য থেকে মনকে টেনে হিঁচড়ে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেছে। হ্যাজাকের আলোয় পড়বে একটু। বেতের চেয়ারে বসে একখানা বইয়ের পাতা ওলটাল। বইটা আর্কিওলজি অফ ইণ্ডিয়া। নিজের দরকারেই ছাপার হরফে দৃষ্টি আটকে রাখতে চেয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে। বার বার মনে হয়েছে, আবীরা আসছে।

আবীরার বদলে এলো আবীরার হাতে লেখা একটা চিঠি। জ্যোৎস্নার রঙে রঙে মেলানো চাঁপা রঙের সিল্কের ঘেরাটোপে ঢাকা একটা ডোলি চারজন কাহার বয়ে নিয়ে এলো কাঁধে করে। নামিয়ে দিয়েও ওরা গান থামায়নি।

বাবলা তলায় চারজনে গলা জড়াজড়ি করে বসে গাইতে শুরু করল বেশ একটু জোরে।

সুরতী ভীল্‌নী, ভীল্‌নী সুরতী…
সুন্দরী ভীল্‌নী তুমি, অতি সুন্দরী।
শ্যামের আছে রাধারাণী,
আমার সুন্দরী রাণী।

নির্জন জায়গা। গম্ভীর গলায় মিষ্টি গান। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। পরিবেশ মনোরম।

ঘেরাটোপ সরিয়ে ডোলি থেকে বেরিয়ে এলো একটি স্ত্রীলোক। নীল সিল্কের বোরখায় ঢাকা আপাদমস্তক। দু'হাত দিয়ে পরদা সরিয়ে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল।

বোরখার ভেতর থেকে একটা চিঠি বার করে নীলাঞ্জনের হাতে দিল। পরিষ্কার বাংলায় লেখা। আবীরা লিখেছে।

…অবাক হওয়ারই কথা। আমি বাঙলাও জানি, শিখেছি। চিঠিতে চোখ বুলাল নীলাঞ্জন বার দুয়েক। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এখুনি যেতে বলেছে আবীরা। রাজকুমার এসেছে। দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

হাত উল্টে রিষ্টওয়াচ দেখল। দশটা। খুব বেশি রাত হয়নি। লোক দিয়ে পৌঁছে দেবে বলেছে। যাওয়াটাই মনস্থ করল।

…ঘেরাটোপ ঢাকা ডোলির মধ্যে বসে আছে স্ত্রীলোকটি। কাহাররা ডোলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গান গাইতে গাইতে। ডোলির পিছু পিছু হেঁটে যাচ্ছে নীলাঞ্জন। কতইবা দুর—খুব বেশি নয়।

রাজকুমার এসেছে, এই কথাই কি বলব বলব করে বলতে পারেনি আবীরা সকালে? না, একথা নয় নিশ্চয়ই। এখন লিখতে পারল, তখন বলতে কি দোষ ছিল। আবীরার মুখ দেখে নীলাঞ্জনের মনে হয়েছে, তাকে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু বলতে পারেনি। বারণ করেছে, না আসতে পারলে ভাবে না যেন। হয়ত রাজকুমার পছন্দ করেনা বেরোন। যাইহোক, সাক্ষাতে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।

…বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার দু'ধারে বালিতে উট শুয়ে বিশ্রাম করছে। লোহানরা যে যার উটের কুঁজে হাত বুলোচ্ছে।

বাড়ির সিংদরজায় এসে থামল ডোলি।

দরজার দুপাশে দুজন বন্দুক কাঁধে সেপাই। স্ত্রীলোকটি প্রবেশ করতে বন্দুক নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু দু'জনে। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে প্রবেশ করল নীলাঞ্জনও। দালান মাড়িয়ে মহল পেরিয়ে যাচ্ছে, কাল এসেছে-গেছে এখান দিয়ে। কালকের নির্বান্ধবপুরী আজ সরগরম। নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত আলোর মালা। সেপাইসান্ত্রীরা লোকজনরা এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করছে। মরা বাড়িটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সিঁড়ির লাল কার্পেটটা বদলে দেয়া হয়েছে। টকটকে লাল রঙটা চোখে বড্ড লাগছে। যেন তাজা রক্তে ডুবনো, পা ফেলার সঙ্গে পায়ের পাতা সুদ্ধ ডুবে যাচ্ছে। যেন রক্তের মধ্যে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওপরে উঠল নীলাঞ্জন।

বারান্দা। স্ত্রীলোকটি বোরখা খুলে বসার চারপাইয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আশ্চর্য লাগলেও সত্যি। স্ত্রীলোকটি আর কেউ নয়— আবীরা।

আবীরা বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

নীলাঞ্জন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমনভাবে আনার মানে কি?

মানে বুঝেছে পরে। নিজের কানকে বিশ্বাস না করেও শুনতে হয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস না করেও দেখতে হয়েছে। অবিশ্বাস্য ঘটনা।

ওধারের ঘর থেকে রাজকুমারের হাত ধরে আসছে আবীরা। হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। রাজকুমারও হাসছে। মুখে চাপদাড়ি, পাকানো গোঁফ। কানে মুক্তোর মাকড়ি, মাথায় হলদে পাগড়ি। পরণে চুড়িদার পাজামা আর মির্জাই। বেশ লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ পুরুষ। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

রাজকুমারের পেছু পেছু চারজন বন্দুকধারীও এলো।

রাজকুমার-আবীরা বসল চারপাইয়ে। দাঁড়িয়ে আছে নীলাঞ্জন। বসেনি।

আর বসতে বললও না কেউ। না রাজকুমার না আবীরা। বন্দুকধারী চারজন ঘিরে ফেলল নীলাঞ্জনকে। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এরকমে হকচকিয়ে গেছে।

বজ্রগম্ভীর স্বরে রাজকুমার বলল, তোমায় আমরা ক্ষমা করতে পারি এক সর্তে। যা নিয়েছো, যদি মানে মানে ফেরত দাও। তা না হলে তোমার অদৃষ্টে যে কি আছে—স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না। আমরা জানি। বলে, নিজের বুকে হাত চাপড়াল রাজকুমার।

আবীরার হাসি থামছে না। হাসতে হাসতে চোখের কোণে জল টলটল করে উঠছে। একি কান্না, না আনন্দ অশ্রু ?

কি—ওদিকে দেখছো কি ? যা বললুম গ্রাহ্য হলনা নাকি ? চীৎকার করে বলে উঠল রাজকুমার। উত্তর দাও শীগগির। আমার সময়ের দাম আছে। দুটো পথের কোনটা বেছে নিতে চাও ? যা নিয়েছো—সমস্ত ফেরত দেয়া, আর না হয় মৃত্যু সাজা।

চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল একবার নীলাঞ্জন—সবার রক্তচক্ষু। সাহায্য করার কেউ নেই।

একি নিছক রসিকতা ? রাজারাজরাদের তো অনেক রকম রসিকতার কথাই শোনা যায়।

কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল নীলাঞ্জন।

রোষে ফেটে পড়ল এবার রাজকুমার।—উচিত মতো শিক্ষা না দিলে কিছু হবে না দেখছি। রাজকুমার কাঁপছে।—আমার কথার অমান্য। কেউ পার পায়নি তোমার কি করি বুঝবে এবার। ওরকম বোকা-বোবা সাজা লোক অনেক দেখা আছে।

মাধোলালকে চাবুক নিয়ে আসতে বলল।

কিসের অভিনয় চলছে, এখনো বুঝছে না নীলাঞ্জন।

চাবুক নিয়ে এসে রাজকুমারের হাতে দিল মাধোলাল।

মাধোলাল চলে যাচ্ছিল, রাজকুমার দাঁড়াতে বলল। প্রশ্ন করল, তুমি যা যা দেখেছো, একটুও গোপন না করে সব বলবে। সত্যি না

বললে, দেখছো তো—। কোমরে ঝোলানো খাপে পোরা তলোয়ারের বাঁটে হাত ঠেকাল।—বুঝলে—কচ্ করে কেটে ফেলবো মুণ্ডুটা। বল।

মাধোলাল জোড়হাত করে বলল—হুজুর, আবীরা বহিন সমস্ত মুক্তোর জেবর খুলে দিল সাহেবকে। সাহেব বলছিল, সনচরীর জিনিস বার করতে গেলে খোঁড়া-খুঁড়িতে খরচ অনেক।

রাজকুমার ক্ষেপে গেল যেন। উঠল চারপাই থেকে। চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল পিঠে সপাং করে। আচমকা আঘাতে নীলাঞ্জন আর্তনাদ করে উঠল।

আবীরা এসে সামনে দাঁড়াল রাজকুমারের। বলল, আমি বেঁচে থাকতে এ কষ্ট করবেন কেন আপনি ?

রাজকুমারের হাত থেকে চাবুক নিয়ে সাপিনীর মূর্তিতে ঘুরে দাঁড়াল আবীরা নীলাঞ্জনকে ছোবল মারার জন্য। আবীরার এ মূর্তির সঙ্গে রাজকুমার পরিচিত। চারপাইয়ে এসে বসল রাজকুমার। উপযুক্ত লোকের হাতে আসামীর শাস্তির ভার ছেড়ে দিয়েছে। ডানদিকের গোঁফটা পাকাচ্ছে আস্তে আস্তে।

আবীরার হাতের চাবুক হিস হিস করে উঠছে। নীলাঞ্জনের পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত ঝরছে। নীলাঞ্জনের হাত পা বেঁধে রেখেছে বন্দুকধারীরা।

নীলাঞ্জন ভাবছে, শয়তানী ছল করে এই খপ্পরে এনে ফেলেছে তাকে। চোখ খুলেছে তার। শয়তানীকে নিজে হাতে শেষ না ক'রে গেলে, মরেও শান্তি হবে না তার। এ রাজারাজড়ার বাড়ি নয়। বদমাশ-খুনে-ডাকাতদের আড্ডা।

আবীরার মা এসে আবীরার হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিল। বলল, ছি ঃ বেটি। ভদ্রলোক তোর যা নিয়েছে সব দিয়ে দেবে। ও রকম মার-ধোর করিসনে।

সেপাইদের দিকে চেয়ে বলল রোশনী, ও ঘরে নিয়ে যা সাহেবকে।

একটু বিশ্রাম করতে দে। কোথায় বিক্রিটিক্রি করেছে, সমস্ত বলে দেবে। আমার মন বলছে।

গর্জে উঠল রাজকুমার। বিক্রি যদি ক'রে থাকে, টাকা দিয়ে দিক আমাদের। আর সেটাকা যদি সরিয়েই ফেলে থাকে এখান থেকে, তাহলে আনিয়ে দিক। আমরা ক্ষমা করব। একটা সরল মেয়েকে— তার একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গয়না আত্মসাৎ, লোকে শুনলে সাহেবের ইজ্জৎ যাবে না?

আবীরার বাপ এসে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। যখন থেকে মেয়ের চাবুক মারা শুরু হয়েছে। কোন পক্ষকে মানাও করেনি, সায়ও দেয়নি। মুখে কুলুপ এঁটে দেখেছিল। খুলল। বলল, আমরা মানীর মান রাখতে জানি। ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে চাইনে এসব। লোভে পড়ে ওরকম অনেকে করে ফেলে। তাবড় তাবড় ভালো লোকেরাও ধোয়া তুলসী নয়। সাহেব দিয়ে দেবে, দিয়ে দেবে।

রোশনী বলল, আবীরা বেটী। মেহমানের পিঠে একটু ঠাণ্ডা মলম বুলিয়ে দাও। নীলাঞ্জনের পিঠে হাত দিয়েই শিউরে উঠল রোশনী। ওড়নায় চোখ মুছে বলল, আহা! বাছারে। পিঠটা যে দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। আবীরার দিকে চেয়ে বলল, হতভাগী, আক্কেলের মাথা খেয়েছিলি কি একদম? বিশবার বলিনি—রাগ হচ্ছে চণ্ডাল— সমঝে চলবি। যেমন সাপ হয়ে কামড়েছিস, তেমনি রোজা হয়ে বিষ তুলতে হবে তোকেই! সাহেবের পিঠ যে ক'দিন না ভালো হয়— তোকেই সেবাশুশ্রূষা করতে হবে।

ঘরে বন্দী। চতুর্দিকে পাহারা। এ খপ্পর থেকে বেরোনোর কোন উপায় দেখছে না নীলাঞ্জন। বাড়ীতেও কোন সংবাদ পাঠানোর পথ নেই। রাত নামার সঙ্গে তার চোখে-মনে জমাট অন্ধকার জেঁকে বসেছে। এ অন্ধকারেই শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে তাকে এই অজানা

অচেনা জায়গায়। কোথায় কবে হারিয়েছিল নীলাঞ্জন, টেরও পাবে না কেউ কোন আপনজন।

খট-খট-খটাং। বাইরে থেকে দরজার চাবিটা খুলল কে। পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল আবীরা। বাতিদানী হাতে। কুলুঙ্গিতে রাখল। সাদা মোম বাতিটা জ্বলছে কেঁপে কেঁপে।

শতরঞ্জির ওপর মেঝেয় পড়ে রয়েছে নীলাঞ্জন। হাত পা পিছমোড়া করে বাঁধা। ঘরে ঢুকল মাধোলাল। খাবারের থালা আর জলের গেলাস রেখে গেল। নীলাঞ্জন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। আবীরা আর মাধোলালকে দেখে গরম রক্তের স্রোত বয়ে গেল শিরায় শিরায়। দেহটা ফুলে উঠেছে। আর একটু ফুললে, বাঁধন ছিঁড়তে পারে। তখন আবীরা আর মাধোলালের নিষ্কৃতি নেই তার হাত থেকে।

শতরঞ্জিতে পাশে বসে বাঁধন খুলছে আবীরা সযত্নে। বলছে ধরা গলায়, আপনাকে নিষ্ঠুরের মতন মেরেছি—আমি আমাকেই মেরেছি।

—এ আবার কেমন কথা। অভিনয়েরও তো একটা সীমা আছে! নীলাঞ্জন নিজেই নিজেকে সচেতন করে তুলতে লাগল। কে জানে আবার কি মতলবে এসেছে আবীরা। মায়াবীর মোহমায়ায় ভুললে চলবে না আর! বাঁধন খোলা হয়ে গেলেই আবীরার টুঁটি টিপে ধরবে সজোরে।

আবীরা বলছে, আমায় অবিশ্বাস করবেন জানি। আর পারছি না ওদের পুতুল হয়ে এ খেলা খেলতে।

হাতের পায়ের বাঁধন খোলা শেষ করে খাবারের থালাটা মুখের কাছে এগিয়ে ধরল আবীরা।

নীলাঞ্জন ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে। কাঁসার থালাবাটি ঝনঝন আওয়াজে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবীরার গলা টিপে ধরেছে নীলাঞ্জন।

শব্দ শুনে দৌড়ে এলো রাজকুমার, দৌড়ে এলো রোশনী। এলো

খরশুন, এলো মাধোলাল। আর এলো রাজকুমারের একান্ত অনুগত প্রিয় সেপাই দু'জন— বীর সিং ও হীরা সিং।

ওরা দু'জনে দু'দিক থেকে টেনে ছাড়িয়ে দিল নীলাঞ্জনকে। হাঁপাচ্ছে নীলাঞ্জন উত্তেজনায়।

চাবুক নিয়ে এগোচ্ছে রাজকুমার। সমস্ত পিঠটার ছাল একেবারে তুলে তবে ছাড়বে। হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিল আবীরা। ওর শাস্তি আমি দেব।

রাজকুমারকে ইশারায় দেখিয়ে দিল নীলাঞ্জনের আঙুলে মুক্তোর আংটিটা। বলল, কুমার সাহেব, আংটিটা খুলে নিন। আপনার মায়ের কাছে রাখা ছিল। আমি লুকিয়ে ওটাও দিয়ে দিয়েছি ওর কথার মোহে। সনচরী-সনচরী করে পাগল হয়ে গেছলুম। এমন ধোঁকাবাজের হাতে পড়বো, ভাবিনি।

এ কোন জগতে—কোথায় আছে নীলাঞ্জন? এক একজন মিথ্যের পাহাড়।

মুক্তোর আংটিটা নীলাঞ্জনের আঙুল থেকে খুলে নিল রাজকুমার। হা-হা করে ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল। আবীরাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যারা এসেছিল তারা সকলেই চলে গেল। বাইরে থেকে দরজায় চাবি পড়ল আবার।

ব্যর্থ আক্রোশে ফুলতে লাগল নীলাঞ্জন।

যা ঘটল, আবীরা আর ধারে কাছে আসবে না। ভয় পাবে। ওকে শেষ করার সংকল্প আর সিদ্ধি হবে না মরার আগে। তার মতন লোককে ফাঁদে ফেলে দুনিয়া থেকে সরিয়েছে সর্বস্বান্ত করে। বেঁচে থাকলে আরও কত করবে। ওকে সরিয়ে মরলে, তবু একটা কাজের কাজ করে যেতে পারবে। কিন্তু সে সুযোগ নষ্ট হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে রাত অনেক হয়ে গেছে। নিশুতি। সমস্ত বাড়িটার কোথাও এতটুকু আলো নেই। নরকের

আঁধার। নিস্তব্ধ রাত্তিরে শ্মশানের ইমারতে যেন বাস করছে সে।

নিজের নিশ্বাস শত সহস্রের নিশ্বাস হয়ে কানে বাজছে। নিজের যন্ত্রণামুক্তির জন্য আঁকুপাঁকু মন দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে ঘুরছে। চতুর্দিকে কত মৃত আত্মা হাহাকার করে উঠছে। ওরা বলছে, আবার সুযোগ আসবে তোমার। মায়াবিনী আসবে আবার। খুব হুঁশিয়ার। হাত থেকে শিকার আর না পালায়। এই ঘরে তোমার মতন বন্দী করে মেরে ফেলেছে আমাদের। তুমিও ওকে মেরে ফেলে মুক্ত হও। আমাদের মুক্তি দাও। ও না মরলে, মুক্তি নেই আমাদের, কারো মুক্তি নেই।

নীলাঞ্জন শুনতে পারছে না আর। দুকানে হাত চেপে ধরল।

দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল আবার। এবারে জোরে নয়। খুব সন্তর্পণে। অন্ধকারে অন্ধকারেরই মূর্তি একটা ঘরে ঢুকল পা টিপে টিপে। কুলুঙ্গির কাছে গেল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল একটা। একটা মোমবাতি জ্বালল। নীল বোরখার মুখের আবরণটা সরিয়ে দিল। ঠোটে আঙুল দিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে নিষেধ করল। বসল শতরঞ্জিতে।

ফিস ফিস করে বলল, আর একটু জোর দিলেন না কেন? মুক্তি পেতুম। নরকে ডুবে আছি আমি। কেউ মুক্তি দিতে পারেনি। কাঁদছে আবীরা।

কান্নার কি এমনই মোহ—যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হ'ক না, তছনছ করে দেয় অগোচরে। আক্রোশ-প্রতিশোধস্পৃহা চাপা পড়ে গেছে। আবীরার ওপর সহানুভূতি জেগে উঠছে। আবীরা মুক্তি চাইছে, মৃত্যু চাইছে। নরকে ডুবে আছে বলছে। আবীরার কান্নার সঙ্গে যেন কার কান্নার মিল খুঁজে পাচ্ছে নীলাঞ্জন! মনে এসেও আসছে না। এ এক অসহনীয় যাতনা।

আবীরা বলছে, যা কিছু অত্যাচার করেছি আমি—ওদের দেখিয়ে। আপনাকে বাঁচানোর জন্য। ওদের মারতে দিইনি, দিলে—

এখন আর খুঁজে পাওয়া যেত না আপনাকে। আমার চোখের সামনে ঘটেছে অনেক।

আবীরার ওড়না ভিজে যাচ্ছে। তবু কান্নার বন্যা থামছে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে উৎকর্ণ হয়ে শুনল আবীরা। দরজার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে কিনা। কারও পায়ের শব্দ হচ্ছে কিনা। কারও নিশ্বাস পড়ছে কিনা।

আবীরা বলল, এ অন্ধকূপে আপনার মরলে চলবে না। আমি জানি আপনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। ওকথা মন থেকে মুছে ফেলুন। বেঁচে এদের চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে হবে। এদের সামনে আমার অন্য চেহারা। ঘাবড়াবেন না। এরা জানে বাইরে পাহারা, ভেতরে চাবি। পালানোর উপায় নেই। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সকলে। ঘুমোলেও জেগে থাকে এরা জানবেন। খাবার এনেছি। শীগগির খেয়ে নিন—কেউ এসে পড়তে পারে। ধরা পড়ে গেলে দুজনেরই মৃত্যু একসঙ্গে।

পুরী ছিঁড়ে তরকারি দিয়ে মুখে পুরে দিয়েছে আবীরা। নীলাঞ্জনের গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোঁক গিলতে চোখ কপালে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবীরা জলের গেলাস তুলে ধরেছে।

চাবি বন্ধ করে চলে গেছে আবীরা।

আবীরা কে? পাষাণী রহস্যময়ী, না প্রকৃতই মমতাময়ী? চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে নীলাঞ্জন। অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নে আবীরাকে একেবারে নিজের লোক মনে হয়েছে। মনে হয়নি মায়াবিনী। আবীরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে। আবীরার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি।

সুখস্বপ্ন ভাঙল নীলাঞ্জনের পরদিন সকালে। তাও আবার আবীরারই চাবুকের ঘায়ে। ভীষণ জ্বালা করে উঠছে পিঠ। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। চেয়ে দেখেছে আবীরার রণরঙ্গিনী মূর্তি। কুমার সাহেব দাঁড়িয়ে পাশে। হাতে কাগজ কলম।

ধমকের সুরে বলেছে আবীরা, লজ্জা করে না কুম্ভকর্ণের মতন পড়ে পড়ে ঘুমোতে? তোর কে কোথায় আছে আপনজন—যারা টাকা দিতে পারবে—চিঠি লেখ্। আমার জেবরের টাকা যতক্ষণ না পাচ্ছি—তোর নিস্তার নেই জানবি। লেখ্ বলছি শীগগির। ভালো মানুষের মতন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে আবার। ওসবে ভুলিনা আমরা। শয়তান কোথাকার।

আর এক ঘা বসানোর জন্য চাবুকটা তুলতে যাচ্ছিল, রোশনী এসে কেড়ে নিল। ভাঙা খনখনে গলায় বলল, আহা মাথা গরম করছিস কেন তুই সাত সকালে? ভদ্রলোকের ছেলে, কাগজ-কলম দিয়ে বসে লেখা না মাথা ঠাণ্ডা করে। অন্যায় করে ফেলে, মনে মনে পস্তাচ্ছে। মুখ দেখলে বুঝিস না? কার কাছ থেকে টাকা আনাবে—চিন্তা করছে দেখছিস না?

রোশনীর মতলব মাথা পেতে নিল আবীরা।

রাজকুমারের হাত থেকে কাগজ কলম নিয়ে নীলাঞ্জনের হাতে দিয়ে বলল, লেখ্।

রাজকুমার বলল, আজেবাজে লোককে লিখে কোন লাভ নেই। যাকে লিখলে কাজ হবে প্রকৃত টাকা আসবে—তাকে লেখো। সে বাবা হ'ক, জ্যাঠা হ'ক, কাকা হ'ক। লেখো, ব্যবসা করতে টাকার প্রয়োজন, শুরু করে বিপদে পড়েছি। দশহাজার চাই। উপস্থিত পাঁচ হাজার দিতেই হবে।

ধনুকভাঙা পণ করে বসল নীলাঞ্জন। —মরি সেও ভালো—লিখবো না।

রাজকুমার রেগে উঠল।—আমার কথা ঠেলে আস্ত মাথা নিয়ে কেউ কখনো ফিরে যেতে পারেনি। আসলি মুক্তোর জেবর। এক একটা দানার দাম হাজার টাকা। তা ও জিনিস পাওয়া যাবে না। বিদেশী লোক বলে ক্ষমাঘেন্না করছি, তাতে লিখবোনা। মুখ ভেংচে বলে উঠল রাজকুমার, না লিখলে, আদালতে নিয়ে গিয়ে তুলোধোনা

করে ছাড়বো। ভারতের সব কাগজেই ছেপে দোব তোমার কীর্তি-কলাপ। একটা সরল মেয়েকে ঠকিয়ে গয়না আত্মসাৎ। তোমার বংশের মুখে চুনকালি পড়বে। আদালতে যেতে হলে, এক কানাকড়ি ছাড়বোনা বলে দিচ্ছি। প্রকৃত যা দাম—দিতে গেলে, বাপ-ঠাকুর্দার কোঠাবাড়ি বিকিয়ে যাবে।

কত ধুরন্ধর। দুষ্টবুদ্ধির দশ মাথা—রাবণের মতন। গালে হাত দিয়ে ভাবছে নীলাঞ্জন। সত্যিমিথ্যে বাইরের লোকের সে চোখ নেই দেখার। সে বোধ নেই বিচার করার। কিছু না হলে, এমনি এমনি আদালতে গেছে, এমনি এমনি একটা মেয়ে দোষ দিচ্ছে?

লেখ, লেখ বলছি। টাকা না পেলে, আমি তোকে জ্যান্ত রাখবো না। উত্তেজনায় আবীরার গলা কাঁপছে।

রাজকুমারের দিকে ফিরে বলল, আপনি যান। কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না আর। বে-আদবের ব্যবস্থা আমিই করছি।

রাজকুমারের সঙ্গে সকলেই চলে গেল।

খুব নিচু গলায় আবীরা বলল, যা করেছি তার জন্য ক্ষমা করবেন। না করে উপায় নেই। দিনরাত ঘিরে রেখেছে এরা এসব করানোর জন্য।

আপনাকে পালাতে হবে। আপনি লিখে দিন চিঠি। পেয়ে যদি কেউ এসে পড়ে এখানে—সন্দেহ দেখা দিতেও তো পারে কারো মনে। বরাত ঠুকে লিখুন। ধরা পড়লেও পড়তে পারে এরা।

একা যখন থাকে, আবীরা নিজের লোক। এত আপনার বুঝি হয় না। ওদের সঙ্গে থাকলে কিন্তু বাঘিনী। আবীরাকে ঠিক চিনতে পারছে না নীলাঞ্জন। এই মুহূর্তে মনে হল ঠিক চিনেছি, পরমুহূর্তেই সমস্ত উল্টে গেল।

ফিসফিস করে বলল আবীরা, ওরা যায়নি জানবেন, আশেপাশেই আছে। লক্ষ্য রাখছে। লিখে ফেলুন। বলা যায় না, এই চিঠি উপলক্ষ্য করে দলকে দল ধরা পড়ে যেতে পারে।

আবীরা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শোনা যায় বিষাক্ত সাপ কামড়ানোর পর নিস্তেজ হয়ে পড়ে নাকি।

নীলাঞ্জনকে দিয়ে তার বাবার কাছে টাকার দাবি করে জরুরী চিঠি লিখিয়েছে। কর্তব্য শেষ করে টলতে টলতে এঘরে এসেছে। চোখের সামনে সব ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেছে। চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিয়ে বিছানায় এসে আছড়ে পড়েছে।

আবীরার চলার ধরনটা কেমন কেমন ঠেকছিল। রোশনী তাড়াতাড়ি এ ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেছে—কি হল রে, কি হয়েছে তোর? আবীরাকে টানাটানি করেছে রোশনী। কোন উত্তর পায়নি। গাল ধরে নেড়েছে—বলছিস নে কেন রে? জলভরা চোখে দেখেছে রোশনী, দাঁতি পড়ে গেছে। আবীরা বেহুঁশ।

মাথায় জল চাপড়ে চাপড়ে জ্ঞান ফিরিয়েছে রোশনী। চোখ খুলে দেখেছে আবীরা, ময়ূরের পালকের পাখা দিয়ে হাওয়া করছে।

ক্ষীণ গলায় বলল, তুমি আমায় একটু একলা থাকতে দাও। শোওগে, যাও।

—বলিস কি রে! এই শরীর খারাপে একলা রাখা যায় নাকি? তুই মেরে তাড়ালেও এ ঘর থেকে কিছুতেই যাবোনা আমি।

—না গেলে, মাথা খুঁড়বো তোমার পায়ে!

—ওমা একি কথা! একলা থাকার জন্যে এ আবার কি ব্যামো হ'ল তোর?

—দোহাই মা! বকিয়ো না আর।

—বেশ। দরজার বাইরে চারপাই পেতে শুচ্ছি আমি। তুই ঘরে একলা থাক।

ঘরে আবীরা। দরজা গোড়ায় খিল অ'াটা, বারান্দায় রোশনী। তুজনেই চুপচাপ শুয়ে আছে চারপাইয়ে। চোখে ঘুম নেই কারো। কেউ কাউকে জানতে দিতে চায় না যে, সে জেগে আছে।

নিঃশব্দে হাপুসনয়নে কাঁদছে আবীরা।

মায়ের কথা মনে পড়ছে, বাবার কথা মনে পড়ছে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করলেও যাবার পথ নেই আর।

মিশনারী স্কুলে পড়ছে তখন আবীরা। আবীরা নয় রেখা। রোশনীর দেয়া নাম আবীরা। রোশনীর কাছে এসেছে অনেক পরে। তাঁর আগে নিজের মায়ের কাছেই তো ছিল।

লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না রেখা। মা বাবাকে বলত, মেয়ের যা মাথা—বড় হয়ে জজিয়তি করবে দেখছি।

বাবা বলত, আমার মেয়ে কত বড় হয় দেখো না! ঠাট্টা করা বেরিয়ে যাবে তোমাদের।

স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত মা জানলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তার দিকে চেয়ে। দেরী হলে, বাবাকে বলত, আমার মনের ভেতর হু-হু করছে কেন? কোন অ্যাক্সিডেন্ট হ'লনা তো?

বাবার আদুরে মেয়ে রেখা। তারও মন যে মেয়ের জন্য অস্থির না হয়েছে, তা নয়। হয়েছে। মায়ের চেয়ে একগুণ বেশীই হয়েছে—বরং মা কখনো কখনো একটু আধটু বকত, বাবা একেবারেই না। তবু মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য, নিজের মনকে শান্ত করার জন্য বকুনির ভান করে বলেছে, তোমার যত সমস্ত খারাপ চিন্তা। কেন—জ্যোতিষীর কথা মনে নেই? কি বললেন—মেয়ে রাজরানী হবে। মিছিমিছি কেন এত ভাবছ বলোতো?

কাঁদো কাঁদো মুখে বলেছে মা, সবই বুঝি, তবু আমার মন মানে না শিবরাত্তিরের দিনে সইয়ের মেয়েটা গঙ্গা নাইতে গেল, ভিড়ের

মধ্যে কোথায় যে হারাল, চার বছর ধরে তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। আমার কেবল মনে হয়, রেখা না হারিয়ে যায়।

—আঃ, কি যে বল তুমি—শুনতে আমার মোটে ভালো লাগে না। রেখা কি ভিড়ের মধ্যে যায়? স্কুল ছাড়া ও এক পাও বেরোয় না কোথাও। তাও তো গাড়ি ক'রে আসাযাওয়া। বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বাবা।

এত বকাবকি—তবু মায়ের একই চিন্তা। চুলের বিনুনি করতে করতে কতবার বলেছে চিবুক ধরে, বাড়িতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারিস নে? আজ খেলা, কাল রিহার্সাল··রোজ একটা না একটা লেগেই আছে।

রেখা বলেছে, আমায় যে কেউ ছাড়ে না, তা কি করবো? রানীর পার্ট করতে হবে আমাকে—একি চাট্টিখানি কথা! কত রকমের চিন্তা আমার। কত সাজা দেয়াদিয়ি। গাছে উঠে পেয়ারা চুরি করেছে যে, তাকে ডেয়ো পিঁপড়ের কামড় খেতে হবে। বেড়ালকে মেরেছে যে, তার সাতদিন মাছ বন্ধ, আর যে কুকুরকে মেরেছে, তাকে রাত জেগে বাড়ি পাহারা দিতে হবে তিনদিন। আরো কত কি আছে।

মেয়েরা কি বলে জানো মা—বলে, রানী সাজলে তোকে যা মানাবে—সত্যি রানী। কাকু ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ছবি তুলে নিয়ে আসবে।

আনন্দে গদগদ হয়ে উঠেছে মা। মেয়ের রূপ চোখে লাগার মতন। যত বড় হচ্ছে তত সুন্দর হয়ে উঠছে। মেয়ের ডানহাতের কড়ে আঙুলে দাঁত ঠেকিয়ে বলেছে, অপদেবতার নজর না পড়ে যেন।

বাবা ঘরে ঢুকে হেসে ফেলেছে। বলেছে, ও আবার কি হচ্ছে? তোমার কুসংস্কার আর গেল না দেখছি। অপদেবতার ঘাড় মটকে দেবনা আমি! আমার মেয়ের ওপর কি করে নজর দেয় দেখি একবার।

মা জিভ বার করে, কান মলে নাক মলে, কপালে হাত ঠেকিয়ে

বলেছে, একথা বলতে নেই। অপদেবতাকে চটাতে নেই। রেগে গেলে অমঙ্গল হবে।

হাসতে হাসতে রেখার পিঠে হাত চাপড়েছে বাবা। রেখাও মায়ের রকমসকমে হেসে ফেলেছে।

এত দূরে—কোথায় সেই মা, কোথায় সেই বাবা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আবীরা।

বিপদের আঁচ জন্তুজানোয়ার যেমন পায়, তেমনি মানুষও পায়। যেখানে রক্তের সম্পর্ক যেখানে নাড়ীর যোগ, সেখানে বোধহয় তাপটা আগে ভাগেই লাগে। মায়ের মন যা বলত, তাই ফলল সত্যিসত্যি।

একদিন রেখা হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল বনেদি বাঁড়ুজ্যে বংশের কুলুজি থেকে। দেবতার কোলে নয় যমের কোলে নয়। অপদেবতার কোলে চিরদিনের জন্য।

সেদিন জন্মতিথি।

রেখাকে নিয়ে সার্কাস দেখাতে এসেছে কাকু। পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি থেকে রেড রোড ধরে হাওড়া ময়দান। ফেরার পথে একটু রাত হয়েছে। ন'টা কি স-ন'টা হবে।

মাঘের মাঝামাঝি। শেষ শীতটা মধ্যিখানে এসে জেঁকে বসেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গাড়ির কাঁচ সব তুলে দেয়া হয়েছে। তবুও ভেতরটা যেন বরফ। শীতে কাঁপছে দেখে গায়ের আলোয়ানটা খুলে কাকু সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল রেখার। মুখটুকু বাদ শুধু।

খুব দ্রুত চলেছে রেখাদের গাড়ি।

অতীত জীবন, সুখের জীবন, পবিত্র জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল রেখার ঝপাং করে।

সামনা সামনি আর একটা গাড়িও ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে। এ গাড়ি যত পাশ কাটাতে চাইছে, ও গাড়িটা ততই সামনা সামনি পড়ছে। দুটি গাড়ি ছাড়া রেডরোড জনশূন্য।

অ্যাক্সিডেণ্ট বাঁচাতে গিয়ে গাছের তলায় রেখাদের গাড়ি থামাতে বাধ্য হল ড্রাইভার।

ও গাড়িও থামল। নেমে এলো জনাচারেক জোয়ান। ঘিরে ধরল গাড়ি। দরজা খুলে জোর ক'রে ঢুকল একজন ভেতরে। ড্রাইভার ও কাকু বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, রুখতে পারেনি।

টাকা পয়সা যা ছিল কেড়েকুড়ে নিয়েছে। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। রেখার যতটুকু মনে পড়ে, ভয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছিল সে আলোয়ানে। জোর করে মুখ থেকে আলোয়ানটা টেনে সরিয়ে দিল একজন। পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল নিস্তব্ধ-নিথর রাতে। বলল, পয়সা কম পেলে কি হবে? অনেক পয়সার জিনিস পেয়ে গেছি।

গাড়ি থেকে টেনে নামানোর কি চেষ্টা তাদের।

রেখা অত শক্তি কোথা থেকে পেয়েছিল তখন, কে জানে। ছোট ছোট হাতপায়ে লাথি কিল-চড়ে নিজেকে আটকাতে চেষ্টা করেছে। ওদেরই একজন—বিকট চেহারা। কোদালের মতন দাঁত বার করে এগিয়ে এলো। একটা ভিজে রুমাল খপ করে চেপে ধরল নাকে। কি উগ্র গন্ধ। দম আটকে যাওয়ার উপক্রম। মাথা ঝিমঝিম করে, ঘন অন্ধকার দেখল চারদিকে। আর কিছু জানে না।

জ্ঞান হতে দেখেছে, এক অন্ধকার রাজ্যে উপস্থিত সে।

এই অন্ধকার রাজ্যে তিন হাত ফেরত হয়েছে রেখা। একজন বিক্রি করল আর এক জনকে, আর একজন অন্যকে। অন্য আবার নিয়ে এসে ফেলল রোশনীর কাছে। মোক্ষম জায়গায়।

রোশনী বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, তোর মতন—আমারও এক মেয়ে ছিল। দশ বছর বয়সে অভাগিনীর কোল ছাড়া হয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় আমার কান্না দেখে বলেছিল, মা! আমি আবার আসবো। মা যদি পেতে হয়—তোমার মতন মা যেন পাই জন্মজন্মান্তরে। সে বেঁচে থাকলে, আজ কুড়িতে পড়ত। দশ বছর বাদে এসেছিস মা! আর যেতে দেবনা তোকে।

রেখার গালে কপালে চুমু খেতে খেতে কান্নায় ভেঙে পড়ে রোশনী।

এ আবার কি কথা শুনল রেখা। কিছু বুঝতে পারল না।

রোশনী বলল, তুই আমার সেই। সেই নামেই ডাকবো তোকে—আবীরা।

মা-বাবার দেয়া নামের মৃত্যু হয়ে গেল। বরাবরের জন্য রেখাকে খুঁজে পাবেনা কেউ—কোন আত্মীয় স্বজন। যে বেঁচে রইল, সে আবীরা। লাল আবীর নয়, কালো আবীর। হাজার ধুলেও এ কালো যায় না কোনদিন।

মা-বাবার জন্য বুকটা ফেটে যায়! ভাইবোনদের কত দেখার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে তো হওয়ার নয়।

দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের সঙ্গে। এদের হাতিয়ার হয়ে। যেমন চালাচ্ছে এরা, তেমনি চলছে, যেমন বলাচ্ছে এরা, তেমনি বলছে। নিজের কোন অস্তিত্ব-সত্বা নেই। যেখানে যে দরের যেমন ধরনের শিকার পাওয়া যাবে—তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য যা শিখিয়ে দেয়া হবে—তাই অভিনয় করতে হবে!

শিকারে সর্বস্ব লুটেও এদের পরিতৃপ্তি নেই। রক্তের পিপাসা এদের রক্তে বয়ে চলেছে অহর্নিশি। যেখান থেকে যখন যায়, শিকারকে শেষ করে দিয়ে যায়। নিজেদের ধরা পড়ার কোন চিহ্নই রেখে যায় না।

দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে সম্মানী ব্যক্তি সেজে, বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা যত্রতত্র। একসময় যাকে খুনী জেনেও ধরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খুনের পর খুন করে পালানোর পর যে পদিয়া ডাকাতের পাত্তা পাওয়া যায় নি—তারই বংশধর ছেয়ে আছে এ দলে।

আছে এদের গুপ্তচর। আছে এদের পাহারা। আছে সব দেশেরই লোক এদের দলে। সব ভাষাই জানে এরা। শিখতে হয় এদের।

আবীরাকে অনেক ইলম দিয়েছে রোশনী। দশ বছর বয়স থেকে

আঠার অবধি পরদার আড়ালে আড়ালে রেখেছে আবীরাকে। তারপর আবীরাকে নামিয়েছে ওদের লোক ধরবার আসরে। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে রোশনী যে, কাউকে ভালোবাসবে না। মনপ্রাণ দেবে না কখনো।

নিজের কথা শুনিয়েছে—।

আবীরার মতন, অত রূপ না থাকুক, গুণবুদ্ধি কম ছিল না। সত্যিকারের ভালোবাসা পায়নি কারো কাছে। নাচে-গানে যাদুর খেলায়—কিসে কমতি ছিল সে?

সম্মতি জানিয়েছে আবীরা। রোশনীর আদেশ শিরোধার্য।

যেদিন প্রতিজ্ঞা করাচ্ছে রোশনী, ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মদনকিশোর। কান পেতে শুনেছিল সমস্ত। দাঁতে দাঁত চেপে, মনে মনে মুণ্ডুপাত করেছে রোশনীর।

রোশনী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, মদনকিশোর ঢুকেছে। বলেছে, তোমার আশায় আমাকে এতদিন আটকে রেখেছে রোশনী। তোমার সঙ্গে শাদী হবে এইটাই জানতুম। লোভ দেখিয়ে, অনেক অসাধ্য সাধন করিয়ে নিয়েছে। এখন উপদেশ হল,—কাউকে ভালোবাসবে না মনপ্রাণ দেবে না।

অনুনয় করে বলেছে মদনকিশোর, তোমাকে এখান থেকে বহু দূরে নিয়ে যাই চল। আমার চোখের সামনে তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে এরা কিছুতেই সহ্য করতে পারবোনা আমি। আজ রাত্রে তুমি তৈরী থেকো।

আবীরা তৈরী ছিল। দলের আওতা থেকে মুক্তি পাক সে অন্তত। তারপর মদনকিশোরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হবে না।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

একটা মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল সেই রাতেই।

রোশনীর ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকা উচিত

হয়নি মদনকিশোরের। ওইখানেই ভুল করেছিল মস্ত। রোশনীর চোখ এড়ায় নি; মদনকিশোর যে-দরজার পাশ থেকে তার কথা শুনছিল—সেই দরজার পাশে দাঁড়িয়েই রোশনী শুনেছে মদনকিশোরের পরামর্শ।

রেগে আগুন হয়ে গেছল রোশনী।

তার পেটের অন্ন, গায়ের গয়না, ভবিষ্যতের মূলধন আবীরা। এতোদিন খাইয়ে পরিয়ে—কত কষ্ট করে মানুষ করেছে। আবীরাই তার রাজপ্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের রাণী। এই রাণীকে ফুসলে নিয়ে পালাবে মদনকিশোর—এত শক্তি ধরে? নতুন ব্যবসা ফাঁদবে ওকে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে। সে আশায় ছাই।

আবীরাকে আগলে বসে আছে রোশনী। রাতের ঝিমুনি সবার চোখে। নেই শুধু তিনজনের। মদনকিশোরের, রোশনীর আর আবীরার।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পা ফেলে ফেলে এলো মদনকিশোর। হাত ঠেকাতেই খুলে গেল দরজা। বন্ধ ছিলনা, ভেজানো ছিল।

তুজন বন্দুকধারী এসে দাঁড়াল মদনকিশোরের পেছনে।

গর্জে উঠল রোশনী।—তোকে আমি নিজে হাতে খুন করবো। রোশনীর রক্তচক্ষু, হাতে ছোরা। এগিয়ে আসছে।

মরিয়া হয়ে ছোরা বার করল মদনকিশোরও।—

রোশনীর দেহটা দ্বিগুণ- ফুলে উঠেছে। এমন রাগী—জানেনা আবীরা। চারপাই থেকে নেমে জড়িয়ে ধরল রোশনীকে।—দরকার নেই, ও-ও বসিয়ে দিতে পারে তোমায়।

—আমায় বসিয়ে দেবে? ওর ঘাড়ে কত রক্ত একবার দেখি। ছেড়ে দে বলছি আবীরা। বুড়ো হ'লে কি হবে- ওর মতন তু'তিনটে জোয়ানের একলাই জান নিতে পারি। সে শক্তি না থাকলে কি আর এই সব দত্যিদানা নিয়ে ঘর করতে পারি?

রোশনীর হাত থেকে ছোড়াটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে আবীরা।

বিফল হয়েছে। আবীরাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে রোশনী। যাওয়ার সময় বন্দুকধারী দু'জনকে আদেশ করে গেছে, গুলি চালাও।

বারান্দায় পা দিতেই, গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ কানে গেছে।

এই প্রথম। দ্বিতীয়—ধরমচাঁদের বেলায়।

তখন বোম্বাইয়ে।

ধরমচাঁদও মদনকিশোরের মতন বলেছিল। এবারে আবীরা ভেবেছিল, ধরমচাঁদকে মদনকিশোরের মতন মেরে ফেলা শক্ত হবে। ধরমচাঁদ ধনী। তাছাড়া প্রতিপত্তি আছে যথেষ্ট! এ দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও ওর কিছু হলে—ওদলের লোকেরা ছেড়ে কথা কইবে না। দু'দলের ঝগড়া বিবাদে ধরা পড়ার আশঙ্কা দু'পক্ষেরই। যাই হকনা কেন—শাপে বর হয়েও যেতে পারে তো আবীরার ভাগ্যে?

সর্বক্ষেত্রে খাটে না যুক্তি। নিজের বেলায় পরখ করে দেখেছে আবীরা। একটাও মিলতে নেই কি!

আবীরাকে নিয়ে পালানোর সব ঠিকঠাক। হঠাৎ গুম খুন হয়ে গেল ধরমচাঁদ। বুকের পাটা ফুলিয়ে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে বোম্বাই সহর ত্যাগ করল রোশনীর দল অন্য জায়গায় পাড়ি দেবার জন্য।

মুক্তি পাবে না আবীরা—দু'দু'বারই আশার আলোফু'ট উঠতে না উঠতেই নিভে গেছে।

মুক্তির আশা আবীরা জলাঞ্জলি দিয়েছে। কিন্তু মানুষকে মুক্ত করে দেয়ার ইচ্ছেটা বিসর্জন দেয়নি, দিতে পারেনি দেবেনা।

বয়স বেড়েছে, সাতাশ। রোশনী তা মুখে আনতে দেয়না। বলে, থুড়ি সাতাশ নয় সতেরো। সতেরোর গড়ন যদি থাকে—সেইটাই হল আসল বয়স—সতেরোই বলবি।

এখন মনে হয় আবীরার সাতাশ নয় সতেরো নয়। সাতাশী। নরকে পড়ে পড়ে পচে মরবে আর কতদিন?

নীলাঞ্জনকে উদ্ধার করতেই হবে। চারপাইয়ে উঠে বসল আবীরা।

রাত পুইয়ে গেছে কখন। ভোরের পাখি ডাকছে, ডাকছে ময়ুর।

রোশনী এসে বলল, শরীর ভালো তো আবীরা? উদাস উদাস দেখাচ্ছে কেন? কাল রাতভোর নির্জলা গেছে। মুখে হাতে জল দিয়ে, সরবৎটা খেয়ে নিবি আয়। মুখখানা শুকিয়ে গেছে বাছার। পেস্তাবাদাম বাটা দিয়ে দুধের সরবৎ ক'রে রেখেছি।

সর্বনেশে মেয়েছেলে রোশনী। সাংঘাতিক মনের ডুবুরিও। চোখ দেখে বুঝে নেয় ভেতরের কথা। ধরে ফেললে রক্ষে নেই। তার গায়ে আঁচড় পড়বে না। ভবিষ্যতের সঞ্চিত সম্পত্তি সে। কিন্তু নিষ্কলঙ্ক ফুলের মতন নীলাঞ্জনকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। ওটা মুহূর্তের ব্যাপার কেবল। কতই বা বয়স নীলাঞ্জনের! গোটা পঁচিশ হল। এর বেশী হতেই পারে না।

আবীরার চোখের কোণে জলের কণা। দু'চোখ করকর করছে, জ্বালা-জ্বালা করছে। বাইরে বেরিয়ে মগের জলে ঝাপটা দিল। বাইরের জল চোখের জল এক হ'য়ে গেছে মিলেমিশে। ধরার চোখ থাকলেও ধরতে পারবেনা রোশনী। পাতলা সরু ঠোঁটে হাসির প্রলেপ।

আবীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল রোশনীও।

দিন সাতেক হয়ে গেলে।

না এলো চিঠি, না এলো টাকা। নীলাঞ্জনের ওপর নির্ম্মম উৎপীড়ন চলল। আবীরা আর চাবুক হাতে করতে পারছে না। ভেঙ্গে পড়েছে। কান্না রুখতেও পারছে না। কি যে কষ্ট আবীরার বলে বোঝানো যায় না অথচ এমন পরিস্থিতি যে চাবুক হাতে নিতেই হচ্ছে, না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু আবীরা কি নীলাঞ্জনকে ওদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ,রোজ চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে তিল তিল করে মেরে ফেলছে না? চেহারাতেই তো মালুম হচ্ছে। কালি পড়ে গেছে সারা শরীরে।

রাজকুমার বলল, লেখ, আত্মহত্যা করবো টাকা না পাঠালে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

কলম-কাগজ আবীরার হাতে দিয়ে চলে গেল রাজকুমার। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আবীরা। বলল, এই শেষ লেখা, লিখুন। আজ রাত্তিরে প্রস্তুত থাকবেন। উট ঠিক করা আছে। স্টেশনে পৌঁছে দেবে আপনাকে। সেখান থেকে যে কোনো ট্রেন আসুক, উঠে পড়বেন। পরে অন্য স্টেশন থেকে কলকাতায় ফিরবেন।

নীলাঞ্জনেরও মাথাটা কিরকম যেন হয়ে গেছে। জেদাজেদি করল না। আবীরা যা বলল, লিখে দিল।

ওড়নায় চোখ মুছল আবীরা। কাগজ-কলম নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দরজার চাবি বন্ধ করে হেলতে দুলতে হাসতে হাসতে রাজকুমারের ঘরে এসে হাজির হল।

—কি—কাম ফতে? রাজকুমার বলল।

—হ্যাঁ, তবে আমার মনে হয় এই চিঠিকেই শেষ চিঠি করা উচিত। একে নিয়ে বেশীদিন থাকলে, আমাদের সম্পূর্ণ লোকসান। বাড়িভাড়া, লোকজনের খরচ—কম নয়। এর কাছে মোটে একটা মুক্তোর আংটি, আর তাঁবু খুঁজে শ'চারেক টাকা—এই পাওয়া গেছে। শাঁসালো ভাবাটা ভুল হয়েছে। দেয়ালে মিছিমিছি রাজাকনোড়ের বাড়ি বলে খোদাই করানো হ'ল। আর্কিওলজিষ্ট সাহেবের কাছ থেকে আর টাকা পাওয়া গেল কই। বাড়ির অবস্থা ভালো থাকলে কি আর আসত না? দূর, দূর! আর দু'চারদিন দেখে ওকে একেবারে খতম করা। বাঁ হাতটা উঁচু করল আবীরা কিছু কাটার ভঙ্গীতে। ডান হাতের কড়ে আঙুলটা একটু বেশী ছোট বলে, ও যা কিছু দেখায়—বাঁ হাত দিয়েই দেখায়। চাবুক মারার সময় যা ডান হাতটা ব্যবহার করে বাধ্য হয়ে।

আবীরার কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হল রাজকুমার। আবীরা যেটা বলেছে, সেটাই যুক্তিসঙ্গত। তবু মাথার ওপর রয়েছে রোশনী।

ও-ই সর্বেসর্বা। পরামর্শ করা উচিত। তা ছাড়া পদিয়া ডাকাতের দূর সম্পর্কের ভাইপোর মেয়ে। সে হিসেবেও ওকে সম্মান না করে পারা যায় না।

রাজকুমার আবীরা—তুজনেই রোশনীর ঘরে গেল।

রোশনী চারপাইয়ে অর্ধশয়ান। মুখে গড়গড়ার নল। আধবোজা চোখে তামাকুর ধোঁয়া টানছে আর ছাড়ছে। মেজাজে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুনগুন করে ধরা ভাঙা গলায় গাইছে – যানে কাজলিয়োঁ বনালুঁ, মহারে নৈনো মেঁ রমালুঁ। তোমায় আঁখির অঞ্জন করি, নয়নে রাখিব ধরি—বঁধুয়া আমার···। রাজপুতানী মেয়ে একটি পা টিপছে।

চোখ-কান-নাক—সবই সতর্ক রোশনীর। পায়ের শব্দে বড় বড় চোখ করে তাকাল। উঠে বসে, বলল, বসো রাজকুমার। সামনের চারপাই দেখিয়ে দিলো হাতের ইশারায়। নিজের কাছে ডাকল আবীরাকে।

রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে আবীরা হাসছে খুব। ওড়না চেপে ধরেছে চোখে মুখে। রাজকুমারও হাসছে।

পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল রোশনী, বেটীকে আজ খুশী দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয় কোন সুখবর আছে।

নীলাঞ্জনের ব্যাপার নিয়ে আবীরার সিদ্ধান্তটা জানাল রাজকুমার। বলল, এখন তোমার মতের অপেক্ষা।

রোশনী দেখছে আবীরাকে। নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কি দেখল, কি বুঝল রোশনী নিজেই জানে। তুহাত দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল আবীরাকে। জড়িয়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে তাকাল রাজকুমারের দিকে।

উল্লাস-উচ্ছ্বাস রোশনীর কথায় ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বলল, আবীরা আমার উপযুক্ত মেয়ে। রোশনীর নাম রাখবে। আবীরা তৈরী হয়ে গেছে। আমি আগে থেকেই জানতুম

সকলকে বলে দিয়েছি, আমি মনে করি তোমরা ওর কথা শুনবে। কোন কিন্তু করবে না। আবীরা যা স্থির করেছে, আমারও তাই মত রাজকুমার।

গড়গড়ার নলটা বিছানার ওপর পড়েছিল। তুলে নিল রোশনী। রূপোর হাঙর মুখটা মুখে পুরে টানল বার চারেক। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করে বলল, মর মুখপুড়ীরা। হিংসেয় ছটফট করে মর। আবীরার মতন হতে পারবি তোরা—রূপে গুণে? সিংহানী আর রহিমাকে কাছে ঘেঁষতে দিইনে আমি। আবীরাকেও নিষেধ করে দিয়েছি, ছায়া মাড়াবিনে ওদের। তোকে দেখে এত জ্বালা—নিশ্বাসের বিষে শুকিয়ে যাবি।

বিছানায় বসে বসে জোড়হাত করে নমস্কার করল রোশনী। গঙ্গৌর গৌরী মাতা মনস্কামনা পূর্ণ করেছে তার। উঠল। কাঠের বাক্স খুলে, গঙ্গৌর পূজোর যবের শিষ বার করে নিজের মাথায় তিনবার ছোঁয়াল। রাজকুমারের মাথায় তিনবার ঠেকিয়ে আবীরার কপালে মাথায় বুলিয়ে দিল। বলল, এইরকম শুভবুদ্ধি যেন থাকে বরাবর। নীরোগ হয়ে বেঁচে থাক মা। আর তুই-তো আমাদের অন্ধের যষ্ঠি--দেখিস সকলকে!

রোশনীর পায়ে হাত দিয়ে আবীরা প্রণাম করল।

চিবুক ধরে আদর করে বলল রোশনী, সত্যিই আবীরার ভক্তি বটে।

মুখোমুখি চারপাইয়ে ঘুমোচ্ছে রোশনী। গভীর নিদ্রা। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। আবীরা উঠে বসল। নামল চারপাই থেকে। মচমচ শব্দ হল চারপাইটার। আবীরা দাঁড়িয়ে চুপচাপ। রোশনী উঠে না পড়ে।

ঘুম ভাঙেনি রোশনীর। ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে পা ফেলে এগোচ্ছে দরজার দিকে। পায়ের মল খুলে রেখেছে পাছে বেজে ওঠে। দরজায় হাত ঠেকাতেই চমকে উঠে থমকে গেল।

—আবীরা! ডাকছে রোশনী।

আবার নিশ্বাস পড়ার আওয়াজ। মুখ ফিরিয়ে দেখল আবীরা। না, জেগে উঠে ডাকেনি। রোশনী ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই ডেকে ওঠে ওকে।

এই ডাকই আবীরাকে বাঁচিয়েছিল একদিন।

চারপাঁচ জনে এসেছে রাতদুপুরে। এই দলেরই ছিল তারা। আবীরাকে নিয়ে পলানোর মতলব ছিল। আবীরাকে মুক্ত করতে চায়নি তারা। চেয়েছিল আবীরার মানসম্ভ্রমের স্তম্ভকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে। তাদের লালসার আগুনে পুড়িয়ে মারতে আবীরাকে।

মানুষ অন্যায় করতে গেলে, একটা চেতনা ঘুমিয়ে থেকেও নড়াচড়া করে ওঠে ভেতরে। সেই নড়াচড়াটাই মানুষের ভয়। কেউ দেখল নাকি, কেউ শুনল নাকি, কেউ জানল নাকি? যত শক্তিই থাকুক দেহে, ধরা না পড়ে পালানোর ঝোঁকটাই বেশী।

ঘটল তাই।

ওরা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে—তার আগে ওদের গুপ্তবিদ্যায় কেরামতি করে দরজা খুলে ফেলেছে নিঃশব্দে বাইরে থেকে—ঘুমন্ত রোশনীর ডাক শুনল। যে ধার দিয়ে তারা এসেছিল, পালাল সেই ধার দিয়েই পালানো বলতে গেলে নিঃসাড়ে নয়। রীতিমত দৌড়ে—প্রাণভয়ে ঘুম ভাঙল আবীরার, ভাঙল রোশনীর। ধরা পড়ল ওরা। বাঁচার জন্য ওদেরই দলের বলে দিল একজন। বাঁচেনি সে, বাঁচেনি ওদের কেউ। মাটির তলায় জীবন্ত সমাধি হল সব ক'টার।

সারাটা দিন হেসেছে খালি রোশনী। আর কোন বেটার নজর পড়বে না আবীরার ওপর। হিম্মত ফলাতে আসবে না রাতদুপুরে।

সেদিনের হাসি দেখে কেঁদে মরেছে আবীরা। সম্ভ্রম রক্ষে হয়েছে তার ঠিক কথা তা বলে পাগল হয়ে যাবে রোশনী!

আবীরাকে দেখে বলেছে রোশনী, তোর তো আনন্দ হওয়া উচিত রে। কাঁদছিস কেন? ভয়ে অমন কাঁটা হয়ে যাচ্ছিস কেন? ভেবেছিস পাগল হয়ে গেছি? তোর এ মাকে পাগল করতে যে আসবে সে নিজেই পাগল হয়ে যাবে।

আবীরা আস্তে আস্তে দরজা খুলল। চুপিসারে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় সামনে পেছনে চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল একবার। নিস্তব্ধ নিঝুম। গোটা বাড়িটা ঘুমে অচেতন! তবুও রাজকুমারের দরজায়, খরশুনের দরজায় কান পেতে শুনল। কোন সাড়াশব্দ নেই।

একবার বলেছিল রোশনী, এদের কাছে একলা বেশি যাতায়াত করবিনে। ওদের মন ভাল নয়। আমি মরলে এরা যদি বেঁচে থাকে, পালিয়ে যাবি যেখানে দুচোখ যায়। এরা যে কি ভয়ংকর জানিসনে। ফণা তুলতে সাহস পায় না আমার দাপটে।

নীরবে দ্রুত পা চালিয়ে চলল আবীরা। নীলাঞ্জনের ঘরের সামনে এসে চনমন করে চাইল একবার পেছনে। তালা খুলে ঘরে ঢুকে অবাক। গালে হাত দিয়ে বসে নীলাঞ্জন।

নীলাঞ্জন মুখ তুলে দেখল একবার। তখুনি দৃষ্টি নামল মেঝেয়। কি মতলবে এসেছে আবীরা কে জানে। আবীরাকে বোঝা ভার, চেনা দায়।

খুব চাপা গলায় নিশ্বাসের আওয়াজে বলল আবীরা। আমার জন্য ঠকেছেন, এদের খপ্পরে পড়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বসে আছেন। বিশ্বাস করতে পারবেন না, জানি। তবু বিশ্বাস করতে বলছি এখন। যার নিশ্চিত মৃত্যু তার ঠকাঠকি বা অন্য কোন ভয়ের বালাই কোথায়?

মাঝের আঙুল থেকে মুক্তোর আংটিটা খুলে নীলাঞ্জনের কড়ে আঙুলে পরিয়ে দিল আবীরা। বলল, এটা আপনার। নীলাঞ্জনের

কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। নির্জীব। সত্যি কি মিথ্যে তাও বিশ্বাস করতে পারছে না হয়ত। হতাশার নাগপাশে মন-স্নায়ুর মেরুদণ্ড দুমড়ে মুচড়ে নুয়ে পড়েছে।

আংটিটা রাজকুমারের কাছ থেকে নিয়ে রোশনী আবীরার মাঝের আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, নকল মুক্তোর গয়না পরে আসল মুক্তো কামিয়েছিস তুই। এটা তোর পাওনা। আঙুলে শত বিছের দংশন অনুভব করেছিল আবীরা। তবু খোলেনি, তবু কাছ ছাড়া করেনি নীলাঞ্জনকে ফেরত দেবে বলে।

আবীরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, আমার পেছন পেছন খুব সাবধানে আসুন। রুদ্ধ নিশ্বাসে চলেছে দু'জনে। দালান পেরিয়ে সিঁড়ি...আঙিনা...চাতাল...খিড়কি।

উট নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোহানা।

গলার সোনার হারটা লোহানার হাতে গুঁজে দিল আবীরা।

নীলাঞ্জন সচেতন হয়ে উঠল।

আবীরা তাকে বাঁচানোর জন্য সত্যই চেষ্টা করেছে। বলল, আমার সঙ্গে চলুন। আমাকে না পেলে, জানতে পারলে, আপনাকে তো আস্ত রাখবেনা ওরা। আপনি না গেলে, আমি যাব না।

নীলাঞ্জনের মনে হয়েছে এমন দেবীতুল্য আবীরাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না তার। কাপুরুষের মতন পালিয়ে লাভ কি?

উটে উঠতে ইতস্তত করছে দেখে আবীরা কান্না-ভেজা গলায় বলল, দেরী করলে, দুজনেরই বিপদ। আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করবেন না আপনি। দোহাই আপনার। আপনি যান।

—আপনি?

—আমি যাবো। স্টেশনে একসঙ্গে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়।

রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে নীলাঞ্জন।

আবীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফিরে এসেছে মহলে।

ভূত দেখার মতন চমকে উঠেছে। সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে রোশনী।

রোশনী ক্ষোভে ফেটে পড়ল। আবীরাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলল, ওকে বিদেয় করলি যখন, ওর সঙ্গে নিজেও বিদেয় হলিনে কেন সর্বনাশী। কেন ফিরে এলি মরতে? দূর হ' চোখের সামনে থেকে। দূর হ'!

আমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছি পাহারা দিয়ে—জানি তোরা চলে যাবি অনেক দূরে। একি করলি? এখুনি কেউ এসে পড়লে, মুখ দেখাবো কেমন করে? তুই যে আমার মহাবিশ্বাসী রে। রাজকুমার-খরশুন এসে পড়লে কি হেনস্থা হবে তোর জানিস নে। আমার কোন কথা শুনবেনা আর। এতদিন আগলে আগলে রেখেছিলুম রাক্ষসদের গ্রাস থেকে। এ ছুতো নিয়ে ওরা পরোয়া করবেনা কিছু। খুন করে ফেলতেও দ্বিধা করবেনা। আমি বলছি, তুই পালিয়ে যা—দেরী করিসনে।

আবীরা বিস্মিত। রোশনী মটকা মেরে পড়েছিল, সব জানে, সব দেখেছে। রোশনীর ভেতর কেউ যে নেই তা তো নয়! আছে আর একজন রোশনী। সে রোশনীর মধ্যে অন্য কারো জন্য থাকুক না থাকুক, আবীরার স্নেহ-মমতার পুঁজি রয়েছে যথেষ্ট।

এতক্ষণে নীলাঞ্জন অনেক দূরে চলে গেছে। আবীরা নিশ্চিন্ত। আবীরাকে যদি এখন রাজকুমার-খরশুনের লোকেরা মেরেও ফেলে, আবীরার দুঃখ নেই।

নীলাঞ্জনের নাম শুনেই ভায়ের কথা মনে হয়েছিল। বাপের কাছে টাকা আদায় করার জন্য চিঠি লেখার সময় সে সন্দেহের অবসান ঘটে গেল নিমেষে। নীলাঞ্জনের রেখাদি আবীরা।

আবীরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে। ভাইকে উদ্ধার করা যায় কি করে? কি করে বাঁচানো যায়?

রোশনী বলল, নিজে বিদেয় হলিনে কেন সর্বনাশী?

হ্যাঁ, আবীরা সর্বনাশী। বিদেয় হবে কোথায় ? মা-বাবা-ভাই-বোনের মুখে চুনকালি দেবার জন্য ফিরে যাবে সেখানে ভাইকে পরিচয় দিয়ে। ছিঃ।

—দাঁড়িয়ে কেন রে হতচ্ছাড়ী। কে আসছে যে—শুনতে পাচ্ছিসনে পায়ের শব্দ ? ফিস ফিস করে বলল রোশনী।

ঘরে ছুটে গেল। বালিশের তলা থেকে ছোরাটা বার করে নিয়ে এলো। আবীরার হাতে দিয়ে বলল, তোর মান ইজ্জৎ তোর মুক্তি। তোর বেইজ্জতি, তোর খুন চোখে দেখতে পারবো না আমি।

কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতর চলে গেছে রোশনী।

আবীরা তরতর করে নেমে এসেছে দোতলা থেকে একতলায়। এক তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে মাটির তলার ঘরে—তয়খানায়।

নীলাঞ্জনের উৎকণ্ঠা বাড়ছে! স্টেশনে এসে অবধি ঘন ঘন পায়চারি করছে। আবীরা আসছে না কেন এখনো ? কথা দিয়েছে ষ্টেশনে আসবে। মনটা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠছে আবীরার জন্য।

ট্রেন আসছে।

আবীরা বলেছে, যে কোন ট্রেনে উঠে পড়তে। কিন্তু আবীরা না এলে কেমন করে উঠবে ?

আবীরাকে দেখতে পেল নীলাঞ্জন।

খুব তাড়াতাড়ি আসছে।

ট্রেন এসে থেমেছে, উঠল আবীরা। উঠল নীলাঞ্জন।

নীলাঞ্জনের কাছে বসেনি আবীরা। বসেছে কোণের দিকটায়।

…ট্রেন চলছে। বাতাসে ঝকঝক আওয়াজ। কামরার ভেতর মন দেহ ক্লান্ত নীলাঞ্জনের। তন্দ্রা আসছে।

দশ বছর পর এই জালোরে আসতে হয়েছে নীলাঞ্জনকে। কার্যগতিকে। অফিসের ওপরওলার আদেশে।

জালোরে আসার প্রবল ইচ্ছে ছিল চলে যাওয়ার পর থেকে। অফিস আসতে দেয়নি। আবীরার জন্যই এখানে আসার ইচ্ছে। যদিও জানে, আবীরাকে নিয়ে রোশনীরা তার পালানো জানার পরই স্থানত্যাগ করেছে ধরা পড়ার ভয়ে। তবুও কেন জানে না এ জায়গার এত আকর্ষণ!

তাঁবু খাটিয়ে সবে মাত্র শুয়েছে। তার আগে আবীরার চিন্তা করেছে খুব। আবীরা কোথায় গেল? তার তন্দ্রা ছুটে যেতেই আবীরাকে দেখতে পায়নি সেদিন ট্রেনের কামরায়। চঞ্চল হয়ে উঠেছে খুব। ট্রেনের গতি তখন চতুর্গুণ। আবীরা কোথায় নেমে গেছে, কখন নেমে গেছে, নীলাঞ্জন কিচ্ছু জানে না।

সকালে ওই বাড়িটায় যাবে একবার এটাই স্থির ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত শেষ হওয়ার আগেই—প্রায় স'চারটের সময় ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ।

তাঁবুর ভেতর দেখতে পেয়েছে আবীরাকে।

আবীরার ছু'চোখ ডেকে এনেছে তাকে তাঁবুর ভেতর থেকে রাস্তায়।

নীলাঞ্জন এসে পড়েছে সেই বেলেপাথরের দোতলা বাড়িটার সামনে। দরজা দিয়ে প্রবেশ করল আবীরা। নীলাঞ্জন অনুসরণ করে চলেছে। সেই চেনা চাতাল চেনা মহল চেনা আঙিনা। খালি একটা জিনিস চেনা নয়। তয়খানা, নেমে যাচ্ছে মাটির তলার ঘরে।

ঘরে এসে হতভম্ব।

আবীরাকে দেখতে পেল না আর। মেঝেয় চোখ পড়তে দেখল, আবীরা শুয়ে আছে। ভাল করে দেখছে নীলাঞ্জন। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল আস্তে আস্তে। দেখল একটা কংকাল। আবীরার। কড়ে আঙুলটা ছোট। আবীরার এই রকমই ছিল।

নীলাঞ্জনের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে। ছেলেমানুষের মতন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কান্না আসছে না। ভীষণ কষ্ট। মনে হচ্ছে আট বছর বয়সের কথা।

বাজী পোড়াতে পোড়াতে আগুন ধরে গেল শার্টে। সেটা কালীপূজোর রাত। রেখাদি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। আগুন নিভল। পিঠে পোড়ার দাগ রয়ে গেল।

মাস তিনেক বাদে শুনল, রেখাদি মারা গেছে। হাসপাতালে দেয়া হয়েছিল, সেখানেই। গুরুতর মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট।

নীলাঞ্জনের মনে হচ্ছে আজ, রেখাদি তখন মরেনি বুঝি। মরেছে, সেদিন নিশুতি রাতে তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে। অস্ফুটে বলল নীলাঞ্জন, রেখাদি।

পোড়ো বাড়ির তয়খানায় একটা আকুতি ভরা প্রতিধ্বনি ঘু বেড়াতে লাগল—রেখাদি, রেখাদি, রেখাদি।

——